জার্নাল ৭১

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

জার্নাল ৭১

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০১৬
সময় প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০২
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৭৩

সময়

সময় ২৮৯

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
দীপ্তি কম্পিউটার্স
৩৮/২খ বাংলাবাজার, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
অধুনা প্রিন্টার্স, ৫০ সুকলাল দাস লেন
সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ১২৫.০০ টাকা মাত্র

JOURNAL 71 by Burhanuddin Khan Jahangir. Somoy First Published : Book Fair 2002, Somoy 2nd Print Book Fair 2016 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka.

Website : www.somoy.com Email : f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 125.00 Only

ISBN 984-458-289-X Code: 289

গিয়াস উদ্দীন আহমেদ
জয়নুল আবেদীন,
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে

'জার্নাল' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো স্বাধীনতার পর, ১৯৭৩ সালে। দীর্ঘদিন পর প্রকাশিত হলো এর তৃতীয় মুদ্রণ। এবার বইয়ের নাম 'জার্নাল' পালটে রাখা হলো 'জার্নাল ৭১'।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর

মার্চের প্রথম দিনগুলি

বক্তব্য একটাই ঃ স্বাধীনতা। বারে বারে ঘুরে ঘুরে বলা, বারে বারে ঘুরে ঘুরে আসা, যেন স্তব যেন তীর্থ; আমরা দিনে কিংবা রাত্রে, কাজে কিংবা অবসরে, মিছিলে কিংবা আলাপে স্তব করে চলি ঃ স্বাধীনতা; আমরা তীর্থযাত্রী ঃ স্বাধীনতার। ভোরে উঠি, জানালায় সে; কাজে যাই, কাজের পাশে সে; খেতে বসি, সামনে সে; মিছিলে, চারপাশে সে; গুলী বর্ষণের মধ্যে, দীপ্ত সে; এ ভাবেই স্বাধীনতা আমাদের ঘিরে আছে, স্বাধীনতার মধ্যে আমরা বেড়ে উঠি। রক্ত নির্ধারিত, মৃত্যু অনিবার্য, তবু স্বাধীনতা; ধ্বংস সত্য, সর্বনাশ নিশ্চিত, তবু স্বাধীনতা। আমি এবং পূর্বপুরুষেরা কয়েদি, তাই স্বাধীনতা; আমি এবং পূর্বপুরুষেরা বিদ্রোহী, তাই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা উপায় আমি থেকে আমরায় আসার; যেই আমরা কথা বলি ভয় পিছু হটে যায়, যেই আমরা জয়ধ্বনি তুলি শহরের শবাচ্ছাদন দূরে উড়ে যায়; আমাদের যতো শব্দ আছে সবকিছুতে ধবনিত স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা এক বিশুদ্ধ ক্রোধ। স্বাধীনতা এক অপ্রকাশিত ভালোবাসা। স্বাধীনতা এক সিংহের বিচরণ। আমি এবং পূর্বপুরুষেরা, আমরা এসবই।

সূর্য তখন ছাই, গান গাওয়া পাখিটা বাসায় ফিরে গেছে, তখনই আকাশে স্পন্দিত হয়ে উঠলো ঃ স্বাধীনতা স্বাধীনতা, মানুষের গলায় গলায় শহর চিৎকার করে উঠলো দূর থেকে দূর গোলাপের মতো ফুটে উঠতে লাগলো যেনো মানুষ জয় করেছে চোখে যা দেখা যায় সবকিছু। তারা দলে দলে রাস্তায়, তাদের হাত আকাশে, আর তাদের গলায় অস্ত্র; সজ্জিত, কখনো বিশৃঙ্খল, উত্তাল, কখনো বিষন্ন; তারা বারে বারে রাস্তায়; এ ভাবেই দিনের অন্তিমে তারা পৌঁছেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতো বন্ধন, জাগরণ থেকে নিদ্রা পর্যন্ত যতো বন্ধন, জীবন যাপনের যতো বন্ধন, সবকিছু মিথ্যা, সত্য শুধু বন্ধনের অবসান, তাই তারা রাস্তায়; শহরটা তারা শব্দ দিয়ে শোধন করে দিচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই অভাব আর অনটন; ঘুম থেকে উঠেই মালিন্য আর কুশ্রীতা; সেসবের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান; তাদের বাধা দেয়ার কেউ নেই, সবই লুকিয়েছে গর্তে, আড়ালে, অন্তরালে, সেখান থেকে সতর্ক চোখে দেখছে দেখছে দেখছে। কিন্তু তারা বেপরোয়া, তারা বিদ্রোহী, তারা বিপ্লবী; তারা চিৎকারে

চিৎকারে তৈরি করছে সুন্দর, জীবন যাপনের জন্য ভাববার জন্য চোখ মেলে তাকাবার জন্য। তাদের চিৎকারে রাস্তার বাড়ি সকল গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে, পার্কের গাছ-সকল ডালে ডালে স্বপ্ন মেলে দিচ্ছে। আর রাত্রে সেই চিৎকার সেই প্রতিবাদ সেই বিদ্রোহ দীর্ণ করে ভেসে এলো রাইফেলের আর মেশিনগানের আওয়াজ; তবু চিৎকার তবু প্রতিবাদ তবু বিদ্রোহ রাইফেলের আর মেশিনগানের আওয়াজ ছাপিয়ে; রাইফেলের আর মেশিনগানের আওয়াজ গলা টিপে কেশর ফুলিয়ে গর্জন উঠছে ঃ স্বাধীনতা স্বাধীনতা; সমস্ত আকাশটা নিশেন হয়ে উঠছে চাঁদের আলোয়, যতোদূর চোখ যায় নিশেন, কাল থেকে কালান্তরে নিশেন হাতে হেঁটে চলেছে মানুষ। কিন্তু রাইফেল আর মেশিনগান ঝাঁঝরা করছে চেনা শহরটা, আর শহরের সব রাস্তা বজ্রের মতো উদ্যত হচ্ছে হত্যাকারীর দিকে; মতিঝিলের টেলিভিশন, লাটভবন, মালীবাগ, কমলাপুর, ফার্মগেট, সব রাস্তাই বজ্রের মতো ফেটে পড়ছে হত্যাকারীর ওপর; চেনা শহরটা, আমর চেনা শহরটা চোখের সামনেই বিদ্রোহী, বিপ্লবী হয়ে যাচ্ছে, ঝাঁঝরা বুক নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, আমি দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছি ঃ আমার স্বাধীনতা। রাত বেড়ে চলে, তারারা ছড়িয়ে যায় আকশে, আর আমার দুহাতে আমার শহর, আমি ঘুমুতে ভুলে গেছি, আমি দুচোখ মেলে স্বাধীনতা পাহারা দিচ্ছি।

ভোর এসেছে, লেবু পাতার গন্ধ বাতাসে, ভোরের আলোর নীল আর শাদা ছড়িয়ে যাচ্ছে, পাতার সবুজ উঁকি দিচ্ছে রক্ত গোলাপের গুচ্ছে গুচ্ছে; ভোর এসেছে, রাস্তা ফাঁকা, গাছের গুড়ি আর ইট কংক্রিটের ব্যারিকেড, সার সার বাড়িতে মানুষেরা কান খাড়া করে শুনছে; ভোর এসেছে, একটি ছেলে বুক ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, বন্ধুরা শহীদ মিনার গাঁথছে। আর আমি দুচোখ মেলে স্বাধীনতা পাহারা দিচ্ছি। আমি, বাংলাভাষার একজন লেখক, আমার ভাষার সব শব্দের স্পন্দিত একটি সত্য ঃ স্বাধীনতা : আমি, বাংলাদেশের একজন ব্যক্তি, আমার দেশের চতুর্দিকে উচ্চারিত একটি শব্দ ঃ স্বাধীনতা; আমি, বাঙ্গালী জাতির এক প্রতিনিধি, আমার জাতির হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত এক ভাষা ঃ স্বাধীনতা; ঐ স্বাধীনতা প্রার্থিত এক রাষ্ট্র খুঁজছে, সেজন্যই বিদ্রোহ, সেজন্যই বিপ্লব; বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে, বিপ্লব মানব সম্পর্ক ও সমাজ সম্পর্ক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য। তাই বিদ্রোহ আর বিপ্লব পরস্পর প্রবিষ্ট পরস্পর সম্পর্কিত, তাই বিদ্রোহের পর বিপ্লব নয়, একসঙ্গে, পাশাপাশি, সমান্তরাল; আমাদের বিদ্রোহ বিপ্লবের জন্য। ঢাকা শহরের চিৎকারে আমি তা-ই শুনি, সারা বাংলাদেশের চিৎকারে আমি তা-ই শুনি। আমি বাংলা ভাষার একজন লেখক, আমার কাছে মানুষের ভাষা তো মিথ্যা বলে না। আমার দায়িত্ব ঐ ভাষা জানিয়ে দেয়া। ঐ ভাষা স্পষ্ট, সোচ্চার, দ্ব্যর্থহীন, সূর্যের মতো উজ্জ্বল, আকাশের নীলের মতো অবারিত, তাকে বিকৃত করার অধিকার কারো নেই। সূর্যকে বিকৃত কে করতে পারে, কিংবা আকাশের নীলকে, কিংবা বাংলাদেশের এই চিৎকারকে ? মানুষের চিৎকার থেকে যে-শব্দের জন্ম তাকে পালন করা আমার

কর্তব্য, কারণ ভাষার রক্ষক আমি, কারণ ঐ চিৎকারে ভাষার উদয় হয়েছে। ঐ চিৎকারে মানুষের সমগ্র অন্তরাত্মা সক্রিয়; বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বোধ, হৃদয়বৃত্তি, পূর্বপুরুষ ঐ চিৎকারে অধিষ্ঠিত; সেজন্য ঐ ভাষা আমার অধিকারে, তাকে নষ্ট হতে দেয়া যায় না। ভাষাকে বিকৃত করে পেশাদার রাজনীতিকরা, তাদের কাছে উচ্চারণ মাত্র কৌশল, সেজন্য ঢাকা শহরের চিৎকার তারা ব্যাখ্যানে ব্যাখ্যানে মলিন করে তুলেছে, কিন্তু ঐ চিৎকারে উচ্চারিত ঃ স্বাধীনতা; লেখক হিসেবে আমার কর্তব্য ঐ উচ্চারণ অবিকৃত রাখা, সারা দেশে পৌঁছে দেয়া, ভাবীকালের জন্য গুছিয়ে রাখা।

যেন ভাবনায় রোদ পড়েছে, ঝকঝক করছে, অনেকদূর উদ্ভাসিত। প্রতিরোধের শহরেও পাখি ডাকে, মহিলাদের কোলাহল শোনা যায়, শিশুর হাসি ভেসে আসে, প্রাত্যহিকতায় জীবনের জয়গান ওঠে। সেই জন্যই জীবনে কোনো দুর্ঘটনা নেই, প্রতিরোধের মতো ঘটনায় আমি জড়িত, ঐ ঘটনা বাইরের কোনো কিছু নয়। প্রতিরোধে আমি অন্তর্ভুক্ত, ঐ প্রতিরোধ আমারও, এড়িয়ে যাওয়ার জো নেই, সেজন্য ঐ পরিস্থিতি আমি বেছে নিয়েছি। ঐ বাছাইয়ের শেষ নেই, কখনো নেই। সেজন্য ঐ প্রতিরোধের সব দায়িত্ব আমার। কোনো বাধ্যতা নেই, কোনো জবাবদিহি নেই, আসলে মানুষী বাস্তবতা অমনই। ঐ প্রতিরোধ আমার, কারণ পরিস্থিতি উৎসারিত, ঐ পরিস্থিতিতে আমার আবিষ্কার ঃ প্রতিরোধের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে আমি। তাই সম্পূর্ণ দায়িত্বেই আমি কর্তব্য বেছে নিয়েছি।

প্রতিরোধে আমি, লেখক হিসেবেই, যা আমি করবো প্রতিরোধের পক্ষে যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দুই ভিন্ন কর্মপদ্ধতির আমি সম্মুখীন; একটি কংক্রিট, অব্যবহিত কিন্তু লেখার প্রতি নির্দিষ্ট; অন্যটি সকলের সঙ্গে যুক্ত, মিছিলে, ব্যারিকেডে, সাক্ষাৎ সংগ্রামে। সংলগ্ন দুই নীতিবোধ; একপক্ষে লেখার প্রতি ব্যক্তিক কর্তব্য, অন্যপক্ষে বিশাল পরিধিতে প্রসারিত কর্মক্ষেত্র। আমাকে বেছে নিতে হবে ঐ দুইয়ের মধ্যে। কোনটি বেশি জরুরি লক্ষ্য ঃ সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে লড়াই করা কিংবা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচলিত থেকে লিখে যাওয়া ? যদি আমি লিখে চলি, লেখাই আমার লক্ষ্য, মাধ্যম নয়; কিন্তু একই যুক্তিতে তাদের আমি মাধ্যম হিসেবে নেবো যারা লড়াই করছে আমার হয়ে; বিপরীত ও সত্য, যদি আমি সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধে এগিয়ে আসি, তাহলে, সকলকে আমি লেখার বিনিময়ে লক্ষ্য হিসেবে মেনে নেবো। তাহলে ? তাহলে আমি কি বলবো যা আমি পারি না অন্যেরা তা করবে ? বরং বিপরীত, বাস্তবতাই কর্ম, সেজন্য কর্মমাত্র অনন্য, সেই সঙ্গে অন্য সম্পর্কিত। প্রতিরোধ পর্যায়ে পর্যায়ে, স্তরে স্তরে; প্রতিরোধ সময়ে কৃষক খেতে সক্রিয়, শ্রমিক কলকারখানায়, সৈনিক যুদ্ধে, সবাই নিজের নিজের কর্ম দিয়ে প্রতিরোধ করে চলেছে, প্রতিটি কর্ম অনন্য, জরুরি, প্রত্যক্ষ; সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি কর্মে যুক্ত, তার নাম প্রতিরোধ। সেজন্য কর্ম খেতে কিংবা কারখানায় উৎপাদনে জড়িত, ঐ উৎপাদন প্রতিরোধের জন্য জরুরি, তাই সম্পর্কিত, উৎপাদন ঐভাবে প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় যুক্ত।

সমাজের সব উদ্যোগ এক লক্ষ্যে নির্দিষ্ট, সেজন্য প্রতিটি উদ্যোগ সমুমূল্যের, সেইসঙ্গে পরস্পর সম্পর্কিত। ঐ কারণেই লেখক হিসেবে আমার কর্তব্য দৃশ্যমান বাস্তবতার বিরোধিতা করা, অনুপস্থিত বাস্তবতা অবিরাম সত্য করে তোলা, বলা, বারে বারে বলা ঃ স্বাধীনতা। প্রতিটি লক্ষ্যেই অন্তরিত সর্বজনীনতা, ঐ অর্থে প্রতিটি লক্ষ্য প্রতিটি ব্যক্তির বোধগম্য। ঐ হচ্ছে মানুষী সর্বজনীনতা, যা-কিনা নিরন্তর তৈরি করা যায়। আমি ঐ সর্বজনীনতা তৈরি করছি নিজেকে বিশেষকর্মে বাছাই করে; ঐ সর্বজনীনতাও তৈরি করছি অন্য মানুষের লক্ষ্য বোঝার মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি ব্যক্তির সংজ্ঞা সেজন্য তার কর্ম সম্পর্কিত, মানুষী বাস্তবতায় প্রতিটি ব্যক্তি কর্মী, তার দায়িত্ব প্রতিরোধকালে সব কর্ম এক লক্ষ্যে উৎসর্গিত করা। ঐ উৎসর্গ থেকে জন্ম নেয় সর্বজনীনতা, অনন্যতা, সমুমূল্যতা। ঐ সর্বজনীনতা বোধগম্য, ঐ অনন্যতা প্রতিটি কর্মের চরিত্র, ঐ সমমূল্যতা প্রতিটি কর্মের সারাৎসার।

সেজন্য আমার কর্ম স্বচ্ছ ও সম্প্রসারিত হচ্ছে, তাতে ধরা পড়ছে দেশ, থমথমে ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে, সব অন্যায় বহিষ্কৃত হচ্ছে, শব্দে এসে যাচ্ছে দুঃসাহসী আক্রমণ, মানুষ মানবিক হচ্ছে এইভাবে। রক্ত, হত্যা, ঘুরে ঘুরে বারে বারে, ঐ রক্ত স্বাধীনতাকেই ডাকে, ঐ হত্যা মানুষদের সাহসী করে তোলে, ঐ ডাক ঐ সাহস ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে চেতনালোকে। ঐ চেতনার পক্ষপাত কর্মের দিকে, উজ্জ্বল রৌদ্রের দিকে, যেখানে জীবন প্রাত্যহিকতায় ইতিহাস তৈরি করে। আসাদ কিংবা ফারুক, আসাদ কিংবা ফারুকের আত্মীয়স্বজন, আসাদ কিংবা ফারুকের বন্ধুবান্ধব, সবাই ব্যক্তি থেকে সমাজে গ্রথিত হচ্ছে, ঘরের শান্তি থেকে প্রতিরোধের সাহসে উদ্দীপিত হচ্ছে, নিঃসঙ্গ ঘৃণা থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে উন্মীলিত হচ্ছে, সেখানে কেউ আর নিছক ব্যক্তি নয়, কিংবা নিরুদ্বেগ সমাজও নয়, বদলে যাচ্ছে দ্রুত, অমোঘ, অনিবার্য; মানুষ নিরন্তর নিজের পরিসর পেরিয়ে যাচ্ছে, নিজের পরপারে প্রতিক্ষেপণ ও নিমজ্জন করেই সে মানুষের অস্তিত্ব অর্থবহ করে তুলছে, সেই সঙ্গে নিজেকে অতিক্রমনের লক্ষ্যে নিয়োজিত রেখে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছে। এই হচ্ছে মানবিকতা; মানুষ নিজেই নিজের নিয়ন্তা, নিজের সিদ্ধান্তে দায়িত্ব সজাগ, নিজেকে অনবরত অতিক্রম করে মানুষ মানবিক হচ্ছে। নিজের মধ্যে সাহস, নিজেকে অতিক্রম করার সাহস থেকে জন্ম নিচ্ছে বিশ্বাস; নিজের প্রতি বিশ্বাস; আসাদ কিংবা ফারুক বিশ্বাসের এক একটি নক্ষত্র, জ্বলে অনির্বাণ; কিংবা তারা বিদ্রোহের গর্জন, দিন থেকে রাতে, জীবন যাপনে; কিংবা তারা বিদ্রোহ বিপ্লবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

স্বাধীনতায় আমি প্রতিশ্রুত, সেখানে আমার সমগ্র সম্ভাবনার প্রতিক্ষেপন, বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঐ সম্ভাবনার পথে দুই আলোক চিহ্ন। বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে আমি বাস্তবতার বর্তমান বিনাশে এগিয়ে যাচ্ছি, নূতন সম্ভাবনা বর্তমানতা বিনাশের শর্ত, কিন্তু কিছুতেই নূতন অস্তিত্ব নয়। সেজন্য স্বাধীনতার চিৎকার প্রথমে বর্তমানতার

বিনাশ, ঐদিক থেকে ঐ চিৎকার পরিস্থিতির অভ্যন্তরীন বিনাশ, সেই সঙ্গে চৈতন্যের দিক থেকে সম্ভাবনায় অংশগ্রহণ। স্বাধীনতার অর্থ বাছাইয়ের স্বাধীনতা, বাছাই-না-করার স্বাধীনতা নয়। সেজন্য যে-বর্তমানতার বিরুদ্ধে চিৎকার কিংবা বিক্ষোভ কিংবা বিদ্রোহ সে-বর্তমানতা দুই দিক নিয়ে উত্থিত ঃ ঔপনিবেশিকতা এবং অভ্যন্তরীন স্থিতিস্থাপকতা। বিদ্রোহ একই সঙ্গে দুই লক্ষ্যে, সেজন্য একটির বিনাশ অন্যটির বিনাশ নয়, কিংবা সম্ভাবনায় অংশগ্রহণ নয়। বিদ্রোহকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে চৈতন্যের সম্ভাবনায় সমগ্রে অংশগ্রহণ সত্য হয়ে ওঠে, স্বাধীনতার বাছাইয়ের পরিসর ব্যাপ্ত, বিস্তৃত ও সামগ্রিক হয়ে ওঠে। আগে মুক্তি পরে বিপ্লব; এর মধ্যে বাছাই-না-করার স্বাধীনতা সোচ্চার, অথচ স্বাধীনতা সামগ্রিক, সম্ভাবনাময়, সৃষ্টিশীল তাকে খণ্ডিত করার অর্থ চৈতন্যের সম্ভাবনায় অংশগ্রহণ খর্ব করে তোলা। সেজন্য বিদ্রোহ থেকে বিপ্লব পরবর্তী স্টেশন নয়, এই স্টেশনে বিভিন্ন ট্রেনের সিগন্যাল দেয়া, একই পরিস্থিতির বর্তমানতা বিনাশ করা, সেইসঙ্গে সম্ভাবনা সত্য হতে দেয়া।

আসলে তাই কি হচ্ছে না এখন ? মানুষ দলে দলে রাস্তায়, চিৎকার করছে ঃ স্বাধীনতা; তাদের আওয়াজে উচ্চারিত ঃ স্বাধীনতা; তাদের চোখে সংহত ঃ স্বাধীনতা; তাদের স্বপ্নে লেলিহান মধ্যদিনের রৌদ্র, শহীদের লাশ তাদের শিরস্ত্রান। আমার হৃদয়ে নির্মিত হচ্ছে ঐসব, জীবনের দিনরাত বিদ্রোহ আর বিপ্লব, চেতনা আর স্বপ্ন, স্বপ্নের লেলিহান রৌদ্র, রৌদ্রের স্বচ্ছতা আর স্থিরতা ঃ স্বাধীনতা মানবিক স্বাধীনতা।

২

পঁচিশে মার্চের পর

চেনা শহরটা পালাচ্ছে, দিনের পর দিন পালাচ্ছে। হেঁটে, ঠেলায়, রিকশায়, গাড়িতে জিনিসপত্র চাপিয়ে মানুষ পালাচ্ছে; শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে দূরের গ্রামে, তারপর আরো দূরে, কোথায় কে জানে। সেই সঙ্গে আমিও পালাচ্ছি জীবন-যাপন, নিদ্রা, স্বপ্ন, সবকিছু থেকে; জীবন-যাপন ছিন্ন-ভিন্ন, নিদ্রা অজানা শব্দ, স্বপ্নের আবাস জানি না; শহরের রাস্তাগুলি শুধু এক তীব্র আর্তনাদ; আর রাতভর কান্না। নিজের বাড়ি ছেড়ে এক ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে উঠেছি, শুধু প্রাণ নিয়ে, এক কামরায় গাদাগাদি, জিনিসপত্র, অভ্যস্ত আরাম, নিজের বাগানের ফুল সবই ফৌত হয়ে গেছে; শুধু আছে কম্পমান জৈব অস্তিত্ব, ঐ অস্তিত্ব এখন এক ক্ষত, জ্বলছে। পাকিস্তান সরকার তার সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছে, আর আমার চেনা শহরটা আর্তনাদ হয়ে ঝরছে চিরকালের মধ্যে। শহীদ মিনার ধ্বংসস্তূপ, নয়াবাজার ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাবন বস্তি ধ্বংসস্তূপ; এখন ধ্বংসই সত্য। ঐ সব স্তূপের নিচে পড়ে আছে ঘরসংসার, হাড়গোড়,

রমণীর বুক, পুরুষের ঠোঁট, উদ্ধারের অতীত তারা, এখন তারা কৃমিকীটের খাদ্য, ঘাতক তাদের পিছনে, লাশ হয়েও তারা ছুটছে ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। লাশেদের স্বপ্ন, আমরা যারা এখনো জীবিত, আমাদের কাছে গচ্ছিত, আর আমাদের গলায় এক আর্তনাদ; আমরা যারা জীবিত, আমরাই ঢাকার কণ্ঠ। কিন্তু কেউ কি শুনছে ঢাকার কণ্ঠ ? কলকাতা ? দিল্লী ? লন্ডন ? নিউইয়র্ক ? মস্কো ? ঢাকা আমার ঢাকা, মানুষের কবর হয়ে যাচ্ছে। মার্চের দিনগুলিতে অনেক স্বপ্ন কুঁড়ি ধরেছিলো, সে সব এখন নেই; মার্চের দিনগুলি মাতাল করেছিলো, সেই থরোথরো উচ্চারণের শেষ হয়েছে; মার্চের দিনগুলি ভবিষ্যত ডেকেছিলো, নোংরা নখ সেই ভবিষ্যত থেকে রক্ত ঝরাচ্ছে। এখন পালাবার পালা, নাকি পিছু হটবার ?

চারটায় এখন দিনের শেষ, তারপর কারফিউ। জানালায় দুচোখ মেলে চেয়ে থাকি। রাস্তা বিরান, বাড়িগুলির জানালা বন্ধ, বাতাস নেই, পাখিরা কি আজকাল বাতাসে বাসা খোঁজে না ! বড়ো রাস্তা থেকে একটা কুকুর কলোনির মধ্যে ছুটছে, আর বড়ো রাস্তায় কনভয় চলছে, সৈন্যভর্তি, চলছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। আর আকাশ চিরে জেটের চিৎকার উঠছে, কোথাও হয়তো চলছে গোলাগুলী ছুঁড়তে। তারপর জীবন যাপনের শব্দ সব শেষ; নিশ্চুপ বাড়ি, শূন্য রাস্তা, দূরে কোনো দৃশ্য নেই, দুচোখে খা খা শূন্যতা; সেই শূন্যতার মধ্যে রোদ মরে যায়, রাতনামে, বাড়িগুলিতে আঁধার জ্বলে ওঠে। কোনো বাড়িতে বাতি নেই, কেউ বাতি জ্বালায় না, অলজ্ঘ অন্ধকার ঘিরে আছে সব; কোনো জানালায় বাতি দেখা দিলে ঐ আলো হত্যা করার জন্য গুলী ছোটে। অন্ধকারে রেডিওর দিকে তাকিয়ে, দেয়ালেরও কান আছে, পাকিস্তান রেডিও বাদে অন্য সব স্টেশন বাতিল, চোখে তৃষ্ণা নিয়ে থাকি তাকিয়ে, মনে হয় কতোদিন গান শুনিনি, সরোদের স্নিগ্ধ নীলের মধ্যে স্নান করিনি কিংবা বেটোফেনের জ্বলন্ত রৌদ্রে উড়ে চলিনি। নিজের নিজের ঘরে আমরা সবাই কারাগারের কয়েদি কিংবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দি; বাইরের পথিবীর বোধ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আর গরম, অসহ্য তিক্ত; ঢাকা শহরকে গড়িয়ে নিয়ে চলেছে বিষুব রেখার দিকে, শহর হয়ে উঠেছে আরো মারাত্মক, হয়ে উঠেছে জঙ্গল, স্যাঁতসেতে ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ হচ্ছে মানুষ, স্মৃতি, লাশ, বাড়ি, পার্ক; কিংবা অন্তহীন গলে যাচ্ছে মানুষদের নিয়ে কীট ও পতঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে, গর্তে; জঙ্গলের সহস্র ডাল-পালার মতো জড়িয়ে ধরছে আমাকে, আর থেকে থেকে শোনা যাচ্ছে হায়েনা আর নেকড়ের ডাক, আমার চেনা শহরে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত ঘুমহীন দুঃস্বপ্ন হানা দিয়ে ফেরে; জানালার বাইরে বাতাস মাঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তোলে, কিন্তু খোলার উপায় নেই, গুলী চালিয়ে দেবে, কিংবা দরজায় লাথি পড়বে ঃ চলো। ফ্যান নেই; অন্ধকার, গরম, ঘাম, দুঃস্বপ্নের আক্রমণ পাগল করে তোলে ঃ আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো।

পঁচিশে মার্চ থেকে ঊনত্রিশে মার্চ, ঊনত্রিশে মার্চ থেকে দশই এপ্রিল, যেন পর্ব থেকে পর্বান্তর, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর, এক জগৎ থেকে ভিন্ন জগৎ, তখন ছিলো

বিদ্রোহ, এখন পরাজয়; তখন ছিলো জয়ধ্বনি, এখন কান্না, তখন ছিলো সূর্যোদয়, এখন সূর্যাস্ত, রক্তের দিনরাত। পঁচিশে মার্চ, রাত দশটা, পল্লবী, ছফার (আহমদ ছফা, গলা টেলিফোনে ঃ শহর থমথম করছে। রাত এগারোটা, ফের ছফা ঃ রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড পড়ছে, ছেলেরা রাস্তায় নেমে পড়েছে। রাত পৌনে বারোটা; ফের ছপা ঃ গুলী চলেছে বৃষ্টির মতো, ট্যাঙ্ক রাস্তায়, জানালায় গুলী এসে লাগছে, চার পাশ থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে; তারপর টেলিফোন মৃত, দশ মাইল দূরের ঢাকা শহর আমার জানার বাইরে। একটা, দুটো, তিনটে, ঘুম নেই; সারা সকাল ধরে যে-অস্বস্তির আক্রমণ ছিলো তাই বুঝি সত্য; চিৎকার করে বিদ্রোহী হওয়া যায় না; সামরিক শক্তি গণতন্ত্রের ভাষা বোঝে না; ভূমিদাস থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ মুখের আলাপে হয় না; দাসের নিয়তি কি নির্ধারিত আমাদের ? ভোর এলো বোমার আওয়াজে, বেলেল্লা চিৎকারে, দৌড়ে সবাই ছাদে, অবাঙ্গালীরা রাস্তায় রাস্তায়, বোমা ফাটাচ্ছে, ঘরে আগুন দিচ্ছে, তলোয়ার নাচাচ্ছে, ভাবছে সামরিক শক্তি তাদের, একই ভাষার দাবীদার যে তারা। চারপাশের ছাদে আমারই বাঙ্গালী সব প্রতিবেশী, অসহায় চোখে তাকিয়ে, বাংলাদেশের মধ্যে বাঙ্গালীরাই কয়েদি। আর রেডিও থেকে ভেসে আসছে ঃ কারফিউ দেয়া হয়েছে, রাস্তায় বেরোলেই গুলির নিশানা বানানো হবে; কিন্তু এখানে কারফিউ নেই, এখানে আমরাই শিকার, খাদ্য ঘাতকের। এখানে আগুন, চারপাশে আগুন, পুড়ে যাচ্ছে অসহায় আর মরিয়ার ঘরবাড়ি; জননী জন্মভূমিতে পুড়ে যাচ্ছে বাঙ্গালীদেরই ঘর আর স্বপ্ন, ঘরের শান্তি আর স্বপ্নের জন্মভূমি। স্বাধীনতা শর্তহীন চুক্তিহীন ঠিকাদারবিহীন, সেই সত্যই চাই, মার্চ থেকে কিংবা, তারও আগে থেকে। সেকথাই আমরা বলেছি রাস্তায়, ময়দানে, কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশে চায় বন্দিদের রাজত্ব, সেজন্যই নেমে গেছে রাস্তায় সেনাবাহিনী, এখানে তাদের ভাষার অনুচরেরা, উন্মত্ত দামামা নিয়ে। আর পোড়াচ্ছে গ্রাম পোড়াচ্ছে বাড়ি পোড়াচ্ছে মানষ, উপরে আকাশ স্তম্ভিত ছাউনি তুলে স্তব্ধ, নীল থরোথরো নয়, ছাই আর ধোঁয়ার যন্ত্রণায় কালোর স্তম্ভ তুলছে। বাগানে ফুলের গায়ে ছাইয়ের গন্ধ, পোড়া মানুষের গন্ধ, ফুলের দিকে তাকাতে গিয়ে ভয়ে আমি শিউরে উঠছি। আর হল্লা উন্মত্ত হল্লা, ধরে নিয়ে এসেছে একটি মানুষ, মোড়ের ওপর দিয়েছে শুইয়ে, রড তরোয়াল ছুরি দিয়ে খুচিয়ে খুচিয়ে মেরে শব বানিয়েছে, তারপর সোয়ারেজের ঢাকনা তুলে দিয়েছে ফেলে ঃ একটি মানুষকে হত্যা করা হলো আর সাক্ষী থেকে গেলাম আমরা। বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছে, আমরা নিজেরাই প্রবাসী নিজেদের ভূমিতে। আর রাত্রে দিগন্তে লেলিহান আগুনের শিখা, পুড়ছে উত্তর আর দক্ষিণ, টঙ্গী আর ঢাকা, শোনা যাচ্ছে গুম গুম শব্দ, আতঙ্কে মনে হচ্ছে মৃত্যুকেই চাই; মনে হচ্ছে জ্যান্ত হয়তো এ নরক থেকে আর বেরোতে পারবো না। রাতে নেই আর ভাস্বর ঘুম ; দিনে সর্বনাশ নিশ্চিত, দিন রাত্রি তাই বিনিদ্র আতঙ্ক; তবু দিন আসে রৌদ্রের দীপাবলী জ্বেলে, আর রৌদ্রে উদ্ভাসিত মানুষের শব, কুকুরও ক্লান্ত মড়া

খেতে খেতে, শকুনদেরও উৎসাহ কম, রাস্তা সাজ কুকুরদের দখলে, আর আকাশ শকুনদের; আর আমরা ঘুমের মধ্যে শুঁকে চলেছি শকুনের আর কুকুরের আহার, শত ফুলও ঐ গন্ধ ধুয়ে দিতে অক্ষম।

ভাষা নয় আর আলো কিংবা অমরার দীপ্তি, এখন বরং কয়েদখানা, যারা বাংলা বলে তারা কয়েদি, তারা দাস; ভাষা এখন দেয়াল; পরাজিতের চিহ্ন; বিজয়ীদের ভাষা ভিন্ন; ভাষা নয় আর জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বময় স্পষ্ট যন্ত্রণা। বমির মতো বাংলাকে উগড়ে দেয়া কি সম্ভব ? কিংবা চৈতন্যে স্মৃতিতে দীপ্ত বাংলাকে গলা টিপে হত্যা করা কি সম্ভব ? সর্বনাশ চতুর্দিকে, ভিন্ন ভাষায় উন্মোচিত যমযন্ত্রণা, সেইসঙ্গে মৃত্যুর পরোয়ানা; সেখানে দুঃস্বপ্নে, ভয়াল নিবিড় নৈঃসঙ্গে অন্বিষ্ট প্রতিরোধের ধ্যান ঃ সজ্ঞানে প্রেমে লালন করো, নিজের মর্যাদার জন্য লালন করো। বাংলা যেনো বীজ স্বপ্ন শিশু গাছ-পালা পশুপাখি বাড়ার বিস্ময়ে জীবনে বেঁচে চলে, যদিও চারপাশে বৃক্ষহীন শষ্যহীন অকাল রৌদ্র কিংবা অমানিশা। ভাবনা জাগছে প্রতিবেশীর ঘরে বসে, এক কামরায় জনা বিশেক পুরুষ মেয়ে বাচ্চা, আশ্রয়দাতা উর্দুভাষী, বাইরে বেলেল্লা হৈ হৈ ; তিনি বাঁচাতে চাইছেন মানুষকে, অন্তিম বিশ্লেষণে মানুষ মানবিক থেকেই যায়। একজন উর্দুভাষী ব্যক্তি একজন বাংলাভাষী ব্যক্তিকে আশ্রয় দিচ্ছেন, বাইরে উর্দুভাষী জনসমষ্টি বাংলাভাষী জনসমষ্টিকে কোতল করছে, ঐ বৈপরীত্য রাষ্ট্র উদ্ভূত। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভাষা ব্যবহার করে মানুষ হত্যা করছে, পাকিস্তান তাই খুনী, জল্লাদ, ঘাতক; পাকিস্তান হত্যা করছে বাংলাকে। আমার ছেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পরম নির্ভরে; আমি তাকিয়ে বাংলার দিকে পরম নির্ভরে; যেন পরম্পরা, ইতিহাস; গ্রথিত হচ্ছি আমি, আমার ছেলে, আমার পূর্বপুরুষেরা, এভাবেই পরস্পরে প্রবিষ্ট হচ্ছি; সন্ত্রাসের মধ্যে এলোমেলো আশা ঘিরে ধরছে, প্রেতলোকের দুর্গন্ধে ভেসে আসছে দিশাহারা সুবাস। হঠাৎ দেখি আমার পাশে বসা মধ্যবয়েসী ভদ্রলোকটি ফুঁপিয়ে কাঁদছেন ঃ স্ত্রী আর ছেলেকে জল্লাদের দল ধরে নিয়ে গেছে। সাতাশে মার্চ গাড়ি করে রওয়ানা হয়েছিলেন ঢাকার দিকে। পথে গাড়ি স্ত্রী ছেলে বেহাত হয়ে গেছে, তাঁকে ফেলে দিয়েছিলো গাড়ি থেকে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পৌঁছেছেন এখানে। আর দরজায় আওয়াজ ঃ এখানে বাঙ্গালীরা আছে ? আশ্রয়দাতা কী সব বলে ফিরে এলেন, পরে শুনেছি টাকা দিয়ে পিশাচদের তিনি বিদায় করেছেন। এ ভাবেই বিকেল এলো, কারফিউর সময় এলো, লুটেরার দল চলে গেলো, আমরা চলে এলাম নিজের নিজের বাড়িতে, প্রবাসীর ঘরে ফেরার মতো। কোথাও কোনো কোলাহল নেই, পোষা কুকুরটা শেকল পরে আছে, যুঁইয়ের লতা বাতাসে কাঁপছে, তারপর রাত এলো নির্বিকার নীল চাঁদের আলো ছড়িয়ে।

দিনের পর দিন একই, এভাবেই; ঊনত্রিশে মার্চ সকাল দশটায় পৌঁছোলাম এসে ঢাকায়। পথের দুপাশে পোড়াবাড়ি আর লাশ, সেন-পাড়া পর্বতা, কল্যাণপুর, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই; পোড়াবাড়ি আর লাশ-

বাংলারই নিয়তি এখন। যতক্ষণ কারফিউ থাকে না শহরে ঘুরে বেড়াই : তেজগাঁ, কারওয়ানবাজার, মগবাজার, রাজারবাগ, কমলাপুর, নবাবপুর, নয়াবাজার, শহীদ মিনার, কাটাবন, বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা সবই আমার অঙ্গ, পোড়া আর ভস্মীভূত, যেনো নিজের লাশ নিজেই দেখছি অপলক চোখ মেলে। ভগ্নস্তূপ আমার শহর, আমি, আমরা সবাই; জীবন আজ দুঃস্থের সংবাদ; রাস্তায় রাস্তায় সৈন্যেরা সঙ্গিন উঁচিয়ে, নিঃশঙ্ক, উদ্ধত; রাস্তায় রাস্তায় আমরা যেন পরাজিতের মিছিল, চোখে জ্বালা তুলে তাকিয়ে থাকি, নিঃসঙ্গ ক্রোধ নিয়ে নিজের মধ্যেই ফেটে পড়ি। আমাদের যাত্রার শেষ কি এখন এখানে, দাসত্বে ? নির্মম নির্বোধ চক্রান্তের শিকারে ?

যার সঙ্গে দেখা হয় একই কথা : চলে যাচ্ছি। ক : চলে যাচ্ছি ; খ : চলে যাচ্ছি ; গ : চলে যাচ্ছি। কেউ কি থাকবে না শেষ পর্যন্ত ? পালাবার সর্বনেশে ডাক সবাইকে অস্থির করছে, নিঃসহায় হয়ে দেখছি। রাজনৈতিক নেতারা নেই, কর্মী বন্ধুরা নেই, সবাই চলে যাচ্চে, থেকে যাচ্ছে সারা দেশের মানুষ জল্লাদদের মুখোমুখি। চিরকালই তাই হয়, সাধারণ মানুষ থেকে যায়, তারা জীবন যাপন নিয়ে লড়াই করে, দুচোখে উন্মীলিত করে স্বপ্ন, দিনরাত ভবিষ্যত নির্মাণ করে মরে গিয়ে, সেজন্যই স্বাধীনতার নিশেন তারা, উড়ছে ঊর্মিল বীজকম্প্র, এখানেই। শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, পোড়াবাড়িতে মানুষ লাশ সরাচ্ছে, পোড়াবাজার থেকে সওদা যোগাড় করছে, জীবন যাপন রচনা করে মৃত্যুকে রুখছে, ঘরে ঘরে এনে দিচ্ছে স্বাভাবিকের আকাশের বাতাসের পৃথিবীর সুর। বেঁচে থেকেই প্রতিরোধ করবো আমরা মৃত্যুকে আর দাসত্বকে, প্রতিরোধ করবো মানুষের পরম্পরা, বন্ধুতা, কর্ম রচনা করে; পালাবো না পালাবো না, নিজের হৃদয়ে বেজে উঠছে তা-ই, ধ্বনিত হচ্ছে সারা শহর জুড়ে।

৩

রাতে স্বপ্ন : আমি আর আমার বন্ধুরা কোনো রেঁস্তোরায় বসে, অপেক্ষা করছি আর কারো জন্য। প্রথম বন্ধুটি হঠাৎই বললেন : তোমার লেখার জয় হোক, লেখার মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকবো। দ্বিতীয় বন্ধুটি বললেন : দোয়া করো ওর জন্য যে এখনো আসেনি। বোধ হয়, তখন একটা গাছে কাক ডাকছে, আর গাছের নিচে কবর খোঁড়া হচ্ছে।

তারপর আর ঘুম নেই। চাঁদের আলোর মধ্যে শহরটা মরে গেছে। ছেলেবেলার কথা ভাববার এত চেষ্টা কাছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু মনে পড়ছে না। জানালার কাঁচে শাদা আগুন জ্বলছে, রাস্তায় চলাফেরার আওয়াজ উঠছে, বোধহয় তারা আসছে। শুধু মনে পড়ছে তন্দুরের রুটির গন্ধ; সাত দিন ধরে আলু সেদ্ধ খাচ্ছি।

অসময় এখন : মৃতরাই হয়তো সুখী। শহরটা এক বন্দিশিবির, উঁকি দিয়ে দেখছি গরাদের ফাঁক দিয়ে, যদি কিছু চোখে পড়ে। মানুষ এখন দুদিকে, কারো জন্য

মৃত্যু আর অপমান, কারো জন্য খাদ্য আর উদ্দামতা। আমরা ভুলে যাচ্ছি আমরা সবাই এক ঃ মানুষ; শিখছি আমরা পরাজিত, তারা জয়ী; পরাজিত মানে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, একা। আমরা দণ্ডিত, শাস্তি দেয়া হয়েছে, চেনাশোনা লোক দেখলে আমরা ফিসফিস করে কথা বলি, আর হাসির মতো একটা কিছু ছড়িয়ে পড়ে একদা যা মুখে ছিলো।

পায়ের আওয়াজ কাছে এসে গেছে, হুকুম শোনা যাচ্ছে, কলেনি কর্ডন করা হয়েছে, তল্লাশি চলবে। ছেলেরা পিতাদের আতঙ্ক, বারো থেকে পঁচিশ বছরের ছেলে এদেশে এখন সন্দেহের; সবকিছুই গোলমেলে; মানুষ থেকে পশুর তফাৎ বলা দুঃসাধ্য; জল্লাদের জন্য দেরি করছি সবাই। ভোরের আলো দেয়ালে আর পায়ের আওয়াজ উঠছে চরাচর লুপ্ত করে।

পাশের ফ্ল্যাটের একটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গেলো। মা আর বাচ্চারা কাঁদছে, কোরান শরিফ স্তব্ধ রেহালে। কপালে আমার ঘাম, বিন্দু বিন্দু; ভুলে যেতে পারি না, ঢাকা শহরে আমার চিৎকার বাজবে রোজ, দিন থেকে দিনে। এবারে আমি নই, আর কেউ; আমার সহ্যের পরপারে; অনন্ত তমিস্রা দিয়ে সব আলো যদি ঢেকে দেয়া যেতো ঃ রাস্তার, বাড়ির, খাদ্যের কিংবা জননীর চোখের। কয়েদে কত নশ্বর জীবন্ত পার্শেল গেলো জানি না, দূরে সেকেন্ড ক্যাপিটাল, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, সেখানে অসংখ্য নিরপরাধ জীবন নষ্ট হচ্ছে। মহিলার কান্না ভোরের প্রাত্যহিকতা দীর্ণ করছে; স্বামী কবরে, মধ্য এপ্রিলে গুলী বিদ্ধ; ছেলেটি এখন কয়েদে; আমার বোধের অতীত কী ঘটছে ঐ সংসারে। হয়তো রোজ রাতে স্বামী ফিরে আসে, হয়তো রোজ রাতে ছেলেটি ফিরে আসবে, তাদের দুচোখে বাজপাখির আগুন, ঐ একমাত্র সান্ত্বনা, নাকি ভবিষ্যত। আর কিছু নেই কান্না, মৃত্যু, কয়েদ ছাড়া; আর কিছু নেই অপেক্ষা করা ছাড়া।

ছত্রখান ঘর, তল্লাশির শেষে। তোশকের তুলো, টেবিলের দেরাজ, পাতা ছেঁড়া বই, খোলা স্যুটকেশ এক গ্রাসের মতো সোজা আমাদের দিকে তাকিয়ে, সেখানে দ্রুত ধ্বংসের ভয়। এসব নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে এখন; আজ অনেক কাজ করার আছে আমার ঃ স্মৃতি হত্যা করতে হবে, নিজেকে পাথর বানাতে হবে, ফের আমাকে বেঁচে থাকার পাঠ শিখতে হবে। সকালের তাপ জানালার বাইরে, বড় রাস্তায় এক সার কনভয়, কলোনি আজ শান্ত, কোথাও কোনো কোলাহল নেই। অমন হবে বহুদিন আমি ভেবেছি, আলোক উজ্জ্বল দিন আর খালি ঘর আর ঘরের মধ্যে বিলাপ। আশ্রয়দাতা ভদ্রলোক ভয়ে নীল, বিস্রস্ত তাঁর চেহারা, তিনি বিনত সরকারি কর্মচারি, আর ধর্মশীল; আর আমি ? হত্যার জন্য চিহ্নিত; বাংলা নামক ভাষার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করি অফুরান; তাই যথেষ্ট কারণ সন্দেহের, বিনাশের। আর পাকিস্তান তো বাংলাকেই বিলুপ্ত করতে চায়, ভাষা আর মানুষকে, ভাষার সাক্ষী মানুষ আর মানুষের নিনাদ ভাষায়।

জল্লাদের দল তোমরা যখন একদিন আসবেই, তাহলে এখনই এসো। তোমাদের জন্য বসে আছি, দরজা খুলে রেখেছি, এসো সহজেই। যে-রূপই তোমাদের পছন্দ এসো, বোমার মতো ফেটে পড়ো, কিংবা গুলীর মতো ধ্বনিত হও, কিংবা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের প্রশ্নের মতো পাগল করে তোলো, তবু এসো। ভয় আর নেই। আকাশে আগুন জ্বলে, রাস্তা-ঘাটের নাম বদলে যায়, হত্যার সাক্ষীরা মরে যায়, তবু কেউ একজন বেঁচে যায়, চিরকাল ভালোবাসায় সব আতঙ্ক সব ঘটনা গেঁথে নেয়। আমার ক্ষেত্রে আমার ছেলে ভালোবাসার দুচোখে অন্তিম আতঙ্ক ঢেকে দেবে, গেঁথে নেবে সব ঘটনা, পরম্পরা মুছে যাবে না, কোনোদিনও নয়। জল্লাদের দল, মনে রেখো, পরম্পরার নির্বাসন নেই।

জেনে ফেলেছি, এখন কি করে মুখ নত হয়, চোখে ফোটে আতঙ্ক, গলায় বেজে ওঠে যন্ত্রণা, বিনীত ঠোঁটে হাসি মিলিয়ে আসে, আর টুকরো টুকরো কথায় জাগে ভয়। সবার কথা মনে পড়ছে, সবাই আমারই সঙ্গে, রৌদ্রে কিংবা অন্ধকারে, বাংলার হৃদয়ে লীন হয়ে যাচ্ছে।

অফিসে বেনামি টেলিফোন ঃ আপনাকে পল্লবীতে খোঁজ করছে। কে আপনি ? জিগগেস করতেই টেলিফোন মৃত। আকাশটা অনেকদূর নীল, দূরের গ্রামগুলি নীলের মধ্যে জ্বলছে, রৌদ্রে অদ্ভুত স্তব্ধ নিসর্গ। কয়েকটা পাখি উড়ছে, জেটের আওয়াজ পেয়েই নিজেদের শরীর মিশিয়ে দিয়েছে গাছের সবুজে। বাতাসে বিশাল আন্দোলন তুলে তিনটি জেট পুবদিকে ছুটছে। অমন আলো অমন স্বচ্ছ উজ্জ্বল নীরবতার মধ্যে জেটের গর্জন গ্রামগুলিকে করে দিচ্ছে উতরোল। শুনেছি গ্রামের মেয়েরা কখনো জেট দেখেনি, অবাক বিস্ময়ে ঘর ছেড়ে তাকিয়ে থাকে বাইরে, আর জেট থেকে মেশিনগানিং হয়, আর বাংলার মেয়েরা মরে যায়, সরলপ্রাণ, নিরপরাধ, আকাশের নিচে সার সার। এর মধ্যে বীরত্ব নেই, সাহস নেই, আছে কেবল স্থূল নির্মমতা, উন্মোচিত হচ্ছে কেবল নরকের চক্রান্ত, আর কিছুই নয়। ঊর্মিল গ্রামগুলি মেঘের মতো দূরে, সেখানে এখন মৃত্যু আর অবসাদ আবার প্রয়াস আর আশা। গ্রামের লোক প্রতিদিন শূন্য বাংলায় আগুন জ্বালা চিৎকার হানে, গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে সে-চিৎকার শোনা যায়, কানে বাজে রোজ কান্নার নির্মাণ। কান্না আর আর্তির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ নির্মিত হচ্ছে এখন।

সকালে তল্লাশি, দুপুরে টেলিফোনে সাবধানী উচ্চারণ; রাত্রে বাসায় থাকা কি নিরাপদ ? বিকেলে বাণিজ্য এলাকা খালি; লোকজন কোথাও নেই। মোড়ে তিনজন সৈন্য দাঁড়িয়ে হো-হো করে হাসছে, আর রাইফেল দিয়ে পেটাচ্ছে বুড়ো এক রিকশায়ালাকে। কি ব্যাপার ? কি কসুর ? রিকশার নাম্বার প্লেট বাংলাতে লেখা, ওসব চলবে না এখন, বাতিল। উর্দু এবং ইংরেজিতে লেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাশ কাটিয়ে এলাম, জোরে গাড়ি চালাচ্ছি, আমারও নাম্বার প্লেট বাংলাতে লেখা। হৃদয় ছিঁড়ে হাহাকার বের হলো আমার, যেনো দুহাত ভরা রক্ত নাকি রক্ত গোলাপ, তাই

দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকলাম অনেকক্ষণ। আমরা, বাঙ্গালীরা, নিজের দেশেই বাতিল হতে চলেছি।

মানুষকে দাস বানাবার প্রথম শর্ত হচ্ছে তার আত্মমর্যাদার বোধ লুপ্ত করে দেয়া। আত্মমর্যাদাই তো মানুষকে মানবিক করে তোলে, তাই যদি লুপ্ত হয় তাহলে কি থাকে ? আমার চেনা শহরটা এখন বিদেশী শহরে বদলে যাচ্ছে, অদ্ভুত সব নাম আশৈশব চেনা এলাকাগুলির দেয়া হচ্ছে; সামরিক কর্তৃপক্ষ কি ভাবে নামের বদল হলেই আজন্মের স্মৃতি মুছে যায় ? স্মৃতি মরে না, একজন বাঙ্গালী মারা যাবে, অন্য জনের হৃদয়ে ঐ স্মৃতি ধ্বনিত হবে, এমন করেই সারাদেশে, হৃদয়ে লালিত হচ্ছে স্মৃতি আর সত্য। আবহমান কালের বাংলার স্মৃতি আর স্বাধীন বাংলার সত্য প্রতিদিন আর প্রতিরাত, উজ্জীবনের বাসা খুঁজে চলেছে। মানুষই নির্মাণ করছে ঐ স্মৃতি আর সত্য, জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে, কথা বলার মধ্যে দিয়ে; তাকে হত্যা করার ক্ষমতা পাকিস্তান তোমার নেই।

সন্ধ্যার মৌন ঘিরে ধরেছে আজুদের বাসা, আজ রাত এখানেই কাটাবো। দরজা খুলে অবাক আজু ঃ সে কি তুমি ? রাত্রে থাকবো; একটু চুপ থেকে আজু বলে উঠেছে ঃ এসো ভেতরে। ঘরের বাতি বাইরে কোথাও নেই, অন্ধকার দিগন্ত থেকে দিগন্তে। রাস্তায় দ্রুত জীপ, একটি কুকুর গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে, এখন কুকুরও নিরাপদ নয় রাস্তায়।

বিছানায় চাঁদ লাফিয়ে এসেছে, জানালার পর্দাও আটকাতে পারেনি। বাতি নেভানো ঘরে ঈশ্বরের মৌলিক অনল জ্বলছে, দুঃখী শহরটা তাকিয়ে আছে অপলক। আজুর এক ভাই ওপাড়ে, বাড়ির কেন খবর নেই, বোন রওয়ানা দিয়েছে এক মাস আগে, পৌঁছুতে পেরেছে কিনা জানা নেই; একই খবর ঘরে ঘরে, এক এবং অভিন্ন, বাংলার ইতিহাস তা-ই।

জীবনে যা-যা ভালোবেসেছি সবই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিগন্তে দেয়াল উঠছে। এক সময় ভেবেছি সারা পৃথিবী আমার উত্তরাধিকার, সব কিছুর অংশীদার আমি; এখন নতুন এক নিয়তির মুখোমুখি আমরা সবাই। আমার হৃদয়ে এখন মৃতেরা আর নির্বাসিতেরা, আমি নিজেই উদ্বাস্তু নিজের অস্তিত্ব থেকে তবু স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে তারার মতো, স্মৃতি আমি নেভাতে পারি না, চাইও না, কারণ স্মৃতি সুখ আর যন্ত্রণা, আমার দুহাতে এই বোঝা; আমি বয়ে চলি অনুক্ষণ, আমৃত্যু এই অঙ্গীকার, তাই নিজের ভেতর থেকে সাহস জাগে বলার ঃ না, যেনো বিদ্রোহ রৌদ্রের, সেই ক্ষমতা নিজের মধ্যে নির্মাণ করে পার হতে হবে ভিখারি দিন আর আকাল রাত, মৃত্যু আর হত্যা, আর লেলিহান নরক।

ভাবনার মধ্যে মধ্যে আজুর গলা ঃ আমরা কি বেঁচে থাকবো ; দেশ কি স্বাধীন হবে; যেনো আয়নায় নিজের মুখ, দেখছি নিজেকে, জ্বালাভরা চোখ আর মরীয়ার চোখ, থেকে থেকে উদ্ভাসিত, দেশেরই আয়নায়। সারা রাত গুলীর শব্দ আর সারা

রাত চাঁদ; আর থেকে থেকে আজুর গলা ঃ আমরা কি বেঁচে থাকবো; দেশ কি স্বাধীন হবে; জানি কিংবা জানি না, এভাবেই সারারাত।

৪

সকালে কিংবা সন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রে কিংবা জ্বলজ্বলে দুপুরে, কখনো তীক্ষ্ম একটা, কখনোবা পরপর পাঁচটা কিংবা ছটা শব্দ; একজন ব্যক্তি মারা গেলো কিংবা কয়েকজন; এখন এভাবেই দিনরাত। ঘড়ির কাঁটা যখন রাত তিনটায়, রাস্তায় গোঁ গোঁ টহলদার সৈন্যের গাড়ি, কান উৎকর্ণ, আমার দরজায় নয়তো। অফিসে দিন দশটা, চোখ জানালার কাচে, ধোঁয়া আর আগুন, অদূরের আর একটি গ্রাম পোড়ালো। বিকেলে রুটির দোকানে, রাস্তায় দ্রুত জীপ, রুটিয়ালার শান্ত গলা ঃ পাড়ার আরেকটি মেয়ে নিখোঁজ। সন্ধ্যায় বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যেনো স্বগতোক্তি ঃ গুলীতে পঙ্গু কোনো ছাত্রের টিউশনি যোগাড় করা সম্ভব। পড়শির আলোচনা ঃ 'ক' কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, কোন খোঁজ মিললো কি। এই হচ্ছে বাংলাদেশ, ঢাকা শহর, জুনে, ১৯৭১-এ।

বন্ধুরা কোথায় জানি না, আত্মীয়রা কোথায় জানি না; হয়তো তাও নয়; জানি তারা কোথায়, কেউ মৃত, কেউ পলাতক, কেউ বিদ্রোহী, জীবনযাপনের বিভিন্ন ছকে সবাই বিদ্ধ; কিন্তু কেউ আর নয় পাকিস্তানের, মরে গিয়ে কেউ পাকিস্তান অস্বীকার করেছে, কেউ পালিয়ে, কেউ বিদ্রোহী হয়ে, নাকি সবাই বিদ্রোহী, ঘৃণায় প্রতিরোধে, সারা দেশটাই। যে-ভাষা সৈনিকদের জবান, উচ্চারণ মাত্র তৈরি করে কয়েদখানা, নয় আর অন্ধকার বিদীর্ণ করা আলোক; বলা মাত্র বাঙ্গালী হিসেবে আমি সনাক্ত, কয়েদি, বর্বর, অ-সভ্য; তাই ক্রোধে অন্ধ আমি, 'আমি কে' প্রশ্নটা তরবারির মতো বিদ্ধ করে ব্যক্তি সমাজ সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রকে।

আমি বাংলা ভাষার একজন লেখক; আমি একজন বাঙ্গালী; আমি একজন আবহমানের বাঙ্গালী, কোনোটাই যথেষ্ট নয় কিংবা সান্ত্বনা নয়, বরং সন্দেহ উদ্দীপক, আততায়ীর লক্ষ্য, ঘাতকের বিষয় ঃ আমার বাঙ্গালীত্বকে হত্যা করার জন্য তারা তৈরি; সৈনিকেরা, রাজনীতিকেরা, আমলারা, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিটি যন্ত্রের সেবকেরা। মনে জাগে প্রবলভাবে ঃ আমি বাঙ্গালী পাকিস্তানে কয়েদি। যাদের আমি মুখোমুখি তারা বাঙ্গালী নয়, তাদের বাস্তবতা বোধ আমার চেয়ে ভিন্ন। তারা পাকিস্তানের বাসিন্দা, প্রেমিক, রক্ষক; আর আমি ওসব কিছুই নয়, নিছক বাঙ্গালী, নগ্ন নিষ্কাসিত, অকলুষ; আমি বাংলার মধ্যে উৎসারিত, উন্মীলিত, উন্মোচিত; আর পাকিস্তান আমার সত্তা থেকে খসে গেছে। এখন প্রতিটি দিনই ব্যক্তিক দিন, যন্ত্রণাদগ্ধ দিন, ব্যক্তির আত্মিক ভ্রমণ যেনো অন্তিমে পৌঁছেছে। প্রতিটি দিনে একটি মাত্র উপলব্ধি আমার মধ্যে জাগছে, একটি মাত্র সত্যের জন্য রোজ আমি নিজেকে

পাকিস্তানের মধ্যে প্রস্তুত করেছি, আমি প্রস্তুত হয়েছি বাংলার জন্য। পাকিস্তান আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, পূর্ণবৃত্ত, নিজের কাছে, নিজের পরিবৃদ্ধি, বিকাশ, মঞ্জুরীর দায়িত্ব চিরকাল নিজের দুহাতে।

বোকা হোক, মাতাল হোক, বিবেকহীন হোক সবাইকেই কোথাও না কোথাও, ভূগোলের কোন খণ্ডে জন্মাতে হয়, তাকে বেড়ে উঠতে হয় কতক জনগোষ্ঠীর মধ্যে। সে-জনগোষ্ঠী থেকে সে হয়তো বিচ্ছিন্ন হতে পারে, স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্য হয়ে, কিন্তু কোনকিছুই তার উৎস মুছে দিতে পারে না, তার জন্মদাগ, সে বয়ে চলে সর্বত্র। ঐ জন্মদাগ ভাষা, বাংলা, বাংলাদেশ; সেজন্য দোকানে যাদের দেখি রাইফেল ঝুলিয়ে জিনিস খরিদে ব্যস্ত কিংবা লরিতে মেশিনগান উঁচিয়ে একাগ্র, কিংবা গ্রাম পোড়ানোর কৃতিত্বে উল্লসিত, তারা আমার কেউ নয়, তারা উদ্যত আমার জন্মদাগ হননে, ভাষার হত্যায়, দেশের বিনষ্টিতে। তারা কে ? তারা চক্রান্ত, নরক, মৃত্যুঞ্জয় মানুষের অপঘাত। তারা খুঁজে ফেরে কাফের আর মারে মানুষ, তাদের শেখানো হয় বাংলাদেশে কাফের থাকে। জেহাদের খাদ্য তাদের অন্বিষ্ট, আর আমরা কড়িকেনা দাসের মতো পাকিস্তানের অন্তর্গত বাংলাদেশে, নিঃসঙ্গ, ভয়ার্ত, চেতনার অন্তিমে।

কাফের কী ? কিংবা ধর্ম ? মানুষ যে-শুভ মঙ্গল কল্যাণের কাছে বিনত তা-ই ধর্ম; সেজন্য ব্যক্তিগত; উৎকর্ষের দিকে দুহাত বাড়ানো; নিত্য রৌদ্রের দিকে দুচোখ অবারিত; তা-ই ব্যক্তিকে শুভ কল্যাণ মঙ্গলের দিকে উন্মীলিত করে তোলে, সমাজেও গেঁথে তোলে ঐ সব; কিন্তু কখনো ধর্ম কি বলেছে ঃ মারো, মানুষটিকে মারো ? যে-রাষ্ট্র মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, হত্যা শেখায়, সেই রাষ্ট্র ব্যক্তি বিবেক গুঁড়ো করে, চূর্ণ চূর্ণ করে, সেই রাষ্ট্রের কাছে আনুগত্য প্রদান মনুষ্যত্ব বিরোধী। কিংবা ধর্ম ব্যবহার করে মানুষকে কাফের ও অন্যান্যে বিভক্ত করে সেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা মনুষ্যত্বের জন্য জরুরি। সেজন্যই সমগ্র সত্তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে একটি মাত্র ধ্বনিঃ হটাবাহার, সমগ্র সত্তা থেকে পাকিস্তানকে হটাবাহার করে দিচ্ছি, জন্ম নিচ্ছি বাংলাদেশে, শুশ্রূষার মতো বাংলাদেশের ইতিহাস আমাকে জড়িয়ে ধরছে। ব্যক্তি তাই পদ্ম হয়ে ফোটে সকল অন্ধকারে, প্রতিবাদ হয়ে রূপ নেয় আকাশে আলোকে, যন্ত্রণায় দুঃস্বপ্নে বিবেকের মশাল হয়। হাবিবুর রহমান, যাঁকে আমি জানি না, তিনি কি তাই নন এখন ? রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের এই অধ্যাপক হঠাৎ শুনতে পেয়েছেন হৃদয়ে বিবেকের ডাক, শান্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন ঃ আমি আর মুসলমান নেই এখন, আমার নাম দেবদাস, তাঁকে পাকিস্তানের সিপাহীরা ধরে নিয়ে গেছে। রাজনীতিতে তিনি কখনো লিপ্ত নন, শুনেছি নির্জনতা প্রেমিক তিনি, গল্প আর অন্তরঙ্গ আলাপ-চারিতায় উন্মীলিত তাঁর প্রতিভা; সেই তিনি ধর্মের ব্যবহৃত রূপে শুনতে পেয়েছেন নিজেকে, হিন্দু নামধারণ করে মনুষ্যত্বের আজ্ঞা মেনে নিয়েছেন, যেনো বলেছেন ঃ আমি মানুষ, ধর্মের অধীন নই। হয়তো বিবেক এখন বিন্দুবিন্দু অশ্রু রক্তের সচ্ছল স্রোতে ভেসে যায়; হয়তো আমরা সবাই এখন রক্তেই লিপ্ত; বাঙ্গালীরা

এখন তাদের লাবণ্যসার রক্তের তরঙ্গে মেশায়; কেনো ? আমরা মানুষ, মনুষ্যত্বেরই অধীন।

মানুষ হয়তো সস্তা এখন, লাশ রাস্তায়, গলিতে, সাঁকোর নিচে, পড়ে আছে উদাসীন, যেনো পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ ভাবে লাশ দেখে মানুষ ভয় শিখুক। মাছে খাচ্ছে, রোদ মারছে, কুকুর এবং শকুনের প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে তার আকৃতি নষ্ট হচ্ছে ঃ কিন্তু মানুষ দেখে, চোখে তার চোটে স্বপ্ন, সে বলে ঃ কেউ একজন মারা গেলো; শহরে যতোদিন ধরে মৃত্যু থাকবে ততোদিন প্রতিরোধের অবসান নেই, মৃত্যু তো প্রতিরোধের অন্য নাম, কেউ-না-কেউ প্রতিরোধ করছে, প্রতিবাদ করছে, তাই লাশ এখন স্বপ্ন, সপ্রাণ মশাল, সাধ্য নেই ঐ অলৌকিক মশাল প্রতিহত করা। এভাবেই সঞ্চারিত হচ্ছে চেতনা, সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আশা, সবেরই উৎস ঐ মৃত্যু ঐ লাশ; বাইরে বৃষ্টি মুষলধারা, বাংলাদেশে বৃষ্টি ঝরছে। গন্ধ নিঃসৃত হচ্ছে ফুলের, বৃষ্টির মধ্যে যত ফুল ফোটে সেই সবের, যেন সর্বনাশী বিস্ফোরণ ঃ জল্লাদের দল তোমরা এখানকার নও। ফুল থেকে লাশ থেকে বৃষ্টি থেকে বৃক্ষ থেকে ধ্বনিত হচ্ছে ঃ জল্লাদের দল তোমরা এখানকার নও।

তাই দিন রাত সহনীয়, নরকের চক্রান্ত তাই নির্বোধ মনে হয়। এতো মানুষ মারছে, তবু মানুষ ফিরে ফিরে আসছে, অজেয়; যেদিকে তাকাই উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে সবদিকে আমরাই, এতো হত্যার পরও আমরাই চারদিকে, প্রবল গর্বিত সারে বেঁচে আছি, তাই মানুষের মুখ এখন আস্তিক আবির্ভাব। বনস্থলী গ্রাম আর শহরের দীপাবলীতে মানুষের মুখ, যেনো বাংলার শ্রাবণ ঐ মুখ শুচি করে দিচ্ছে, বাংলার আশ্বিন হয়তো ঐ মুখে অমরার দীপ্তি এনে দেবে, আর বাংলার অঘ্রাণ ঐ মুখে ফোটাবে রোমাঞ্চিত কূজন; আমি দেখি সর্বত্র মানুষের মুখ, তাই বেঁচে আছি এই নরকে। তরাঘাটে কিংবা ঘোড়-ঘাটে গাছে-গাছে পেরেকবিদ্ধ মানুষ, দুহাত ছড়ানো, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের হত্যা করেছে, তবু তাদের রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে প্রতিটি জীবিত ব্যক্তির হৃদয়ে, তারা মিশে যাচ্ছে চেতনার আশ্বস্ত নিখিলে, রৌদ্র ও বৃক্ষের ব্যাপ্তিতে তারা মিশে যাচ্ছে, তারা যিশু, নির্মাণ করছে ভবিষ্যত, মানুষের পরম্পরা; তাদের দুহাতে ছড়ানো আবিশ্ব বাংলাদেশ। সেজন্য রিকশাওয়ালার গলায় শুনি ঃ ভয় কি; সহকর্মীর গলায় শুনি ঃ ভয় কি; প্রতিবেশীর পাঁচ বছরের মেয়ের হাসিতে শুনি ঃ ভয় কি; পুরানো বইওয়ালার বিড়বিড়ে শুনি ঃ ভয় কি।

এতো বই, অজস্র, অফুরন্ত; ফুটপাতে উপচানো; হাঁটা দুঃসাধ্য; সারসার বইয়ের মিছিল; ইংরেজি কিংবা বাংলা, চিরায়ত কিংবা পেপার ব্যাক, বিরল কিংবা চলতি, চকচকে মলাট কিংবা ছিন্ন প্রায়, জীবনের খাদ্য সারসার সাজানো; চোখে অলজ্জিত উন্মীল, চোখে গেঁথে যায় বহু দেশ ও বহু শতাব্দী, মন সংহত ও সংবৃত, নিজের অজান্তেই মগ্ন হয়ে যাই নিভৃত ধ্যানে ঃ এ সব বই যেনো বাংলাদেশের নিয়তি, ঘর থেকে লাইব্রেরি থেকে ফুটপাতে এখন, বিক্রি হচ্ছে বিস্রস্ত হয়ে। বই তুলি, নাম

লেখা, তাঁর সঙ্গ সারাক্ষণ, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, আমার শিক্ষক, তিনি এখন শুধু একটা নাম, স্মৃতি, আর কিছু নন। ছাব্বিশে মার্চ ধলপহরের সময় জল্লাদের দল তাঁকে গুলী করে বাড়ির বাইরে ফেলে রেখে যায়, আর ঊনত্রিশে মার্চ তিনি মারা যান হাসপাতালে। একটা গুলী লেগেছিল তাঁর গলায়, চূর্ণ করেছিল তাঁর মেরুদণ্ড; অন্য গুলিটি তাঁর পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে পেট বিদীর্ণ করে বেরিয়ে গিয়েছিলো। তাঁর মৃতদেহ সৎকারের জন্য দেয়া হয়নি, তাঁর দাহ হয়নি, তাঁর মৃতদেহ হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্য, সনাক্তহীন বিস্মৃতিতে তিনি বিলীয়মান। যেন তিনি ঈষৎ কৌতুহলে জিগ্‌গেস করলেন ঃ ভালো তো, আর হঠাৎ আমার চোখ ভিজে এলো। মনে হলো তাঁর কথা, মার্চের গোড়ার দিককার ঃ দেখো ভায়োলেন্সের যে-কাল্ট তৈরি হচ্ছে তা ভালো নয়, ভালো নয়; তাঁর মৃদুকণ্ঠের সামনে আমি নীরব ও নতদৃষ্টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশ্রাম কক্ষে সকাল দশটার আবহাওয়া, খালি চায়ের পেয়ালা টেবিলে। তিনি চোখ মেলে কথা বলছেন, মনে নেই কি জবাব দিয়েছি, কেমন লাগলো, কেমন একটা বিহ্বলতায় সবকিছু অস্পষ্ট হলো; তিনি শুধু তাকিয়ে; বহুদিন তিনি বই হাতে তুলে দিয়ে আমাকে শান্তি দিয়েছেন ; আর তাঁরই বই দিয়ে হতমান নিষ্পিষ্ট প্রত্যহ আমি ঢেকে দিচ্ছি!

চারপাশে জুনের বিকেল, রোদ মরে যাচ্ছে, বাতাসে শকুনের আর কুকুরের গন্ধ, মানুষেরা সরে সরে যাচ্ছে নিজের নিজের ঘরে, দোকানে ঝাঁপ পড়ছে, রাস্তা ফাঁকা হচ্ছে, ছুটে ছুটে আসছে জল্লাদদের জীপ, দেখছে সেসব মরীয়ার চোখ আর জ্বালাভরা চোখ, আর চারপাশে সার সার পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে, গোরস্তানে পতাকার মতো, বাংলাদেশের কবরে।

৫

কতোদিন বেড়াতে যাইনি। সূর্যাস্ত দেখে বাসায় ফিরে আসিনি, ফিরে আসিনি শহরের অদ্ভুত আলোর মধ্যে দিয়ে মহিলাদের উন্মুখ বন্ধুত্বে। সে-বন্ধুত্ব হাসি, ঠাট্টা, হৈ চৈ, কিংবা আনন্দ নাকি সুখেরই আলিঙ্গন। ওভাবেই জীবনে ফিরে আসা, ওভাবেই সবার সঙ্গে যুক্ত থাকা, ওভাবেই পুষ্টি আর উপকার। বন্ধুত্ব আর সূর্যাস্ত আর অদ্ভুত আলোর মধ্যে হেঁটে হেঁটে আসা সবই বহুদূরের মনে হয়। বন্ধুত্ব সন্দেহের, সূর্যাস্ত আরো অন্ধকারের, অদ্ভুত আলো আমার আর নয়। একা, নিজের মুখোমুখি একা আমি; নিজের মধ্যেই সমর্পিত, লুপ্ত, উৎসারিত; নিজের মধ্যেই জেগে ওঠে অদ্ভুত আলোর আকাঙ্খা, সূর্যাস্তের চিৎকার, বন্ধুত্বের প্রবল স্রোত, কোন কিছুই আমাকে পৃথিবী থেকে বিযুক্ত করতে পারছে না। আমার সকল প্রয়াস হচ্ছে সব দুর্ভাগ্য, হতাশার মধ্যেও ফের সম্পর্কে আসা। জানি পথ নেই, তবু নিরন্তর প্রয়াসে প্রস্তুত থাকবো। আসল হচ্ছে ঃ নিজেকে ধ্বংস হতে না দেয়া, হতাশার মধ্যে নিজেকে কবর না দেয়া;

সমান সাহসে হাঁ এবং না বলার অধিকার অর্জন করা। মানুষ, বস্তু প্রস্তুত আমার জন্য, আর আমিও তাদের জন্য, সকল শক্তি ও সকল বিষণ্নতা নিয়ে আমি তাদের আকাঙ্খা করে চলেছি। এখানে, এই ঢাকা শহরে, আমি জীবন উপার্জন করছি স্তব্ধতা ও গোপনীয়তার মধ্যে দিয়ে।

সবাই খোঁজ করে নিরাপদ এলাকার কথা। এমন এলাকা কোথায় ? কেউ কি জানে ? 'নিরাপদ' কথাটাই তাই আমার এখন বোধগম্য নয়। তবু দেখি মানুষ এপাড়া থেকে ওপাড়ায় চলে যায়, বাসা বদল করে, হয়তো ভাবে ঃ আজ রাত নিশ্চিন্তে যাবে। সব মিথ্যে করে ধরপাকড় হয়, বাজারে আগুন জ্বলে ওঠে, জ্যান্ত মানুষ লাশ হয়ে যায়। নিরাপত্তার বোধ নষ্ট, অলীক। সংগ্রহ এখন জঞ্জাল, ভার। ঘর, বইপত্র, আসাবাব সামগ্রী সবই অর্থহীন, রোজ যখন ঘর কিংবা পাড়া বদল করতে হয় তখন জীবনের ফর্দ তৈরি করে লাভ কি। ঘর নিরাপত্তা দেয় না, বই দেয় না, আসবাব দেয় না। প্রিয় সব সামগ্রী ফেলে পালাতে হয়, শুধু জীবন নিয়েই জীবন যাপন। সেজন্যই মনে হচ্ছে, নিরাপত্তার নির্বাসন এখন। রাত্রে কখনো বনানী কখনো কাকড়াইল কখনো সোবহানবাগে থাকি, ঐ সবের দরকার তাই অলীক, একমাত্র সত্য বেঁচে থাকা, জীবন থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বেঁচে থাকা। সেই সঙ্গে শিখছি উদ্বাস্তু কিংবা ছিন্নমূল শব্দের অর্থ ঃ জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে; বই পড়ে আগে উদ্বাস্তু হওয়ার প্রয়াস করেছি, নিঃসঙ্গতায় নিজেকে পীড়িত করেছি, কিন্তু ঐ প্রয়াস ঐ পীড়ন নিজেকেই শুধু বিক্ষত করেছে, প্রতিবেশে সত্য হয়নি, এখন প্রয়াসহীন পীড়নহীন সবকিছু ঃ আমি উদ্বাস্তু ছিন্নমূল নিঃসঙ্গ সহজেই, ফেরার পলাতক ঘর থেকে ঘরে। জরুরি এখন পকেটে কিছু টাকা আর টুথব্রাশ আর আইডেনটিটি কার্ড, এই নিয়ে ভিন্ন বাসায় রাত যাপন, ভিন্ন বাসায় ভোর হয়, নীল মেঘের মধ্যে রোদ ফোটে; আরেকটা দিন সামনে।

আমি এখন আইডেনটিটি কার্ডে পরিণত। মধ্যে মধ্যে চেকপোস্ট, কখনো দেখে ছেড়ে দেয় কখনোবা জিজ্ঞাসাবাদ করে, গাড়ির ভেতর তদন্ত করে। আইডেনটিটি কার্ড কি আমার পরিচয় চিহ্ন, স্মারক নাগরিকত্বের, বিশ্বস্ততার ? নাকি কেউ যাতে ফেরার না হতে পারে সেজন্য ? আমার চেনা শহরটায় আমাকেই পরিচয়পত্র বহন করে বেড়াতে হচ্ছে আর জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা, যারা আমার কেউ নয়, শহরটার কেউ নয়, ভিনদেশী দখলদার বাহিনী। সন্ধ্যায় কাকরাইলের মোড়, চেকপোস্ট, গাড়িতে স্ত্রী আর পুত্র, গাড়ির সার দাঁড়িয়ে, আধ ঘন্টা পর আমার পালা, টর্চ জ্বেলে আমার চেহারা আর আইডেনটিটির ছবি মিলিয়ে দেখছে, স্ত্রী উর্দুতে বললেন ঃ মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে। ভ্রু কুঁচকে একবার আমাকে দেখলো, একবার স্ত্রীকে, তারপর উচ্চারিত হলো রায় ঃ গাদ্দারকে কেনো বিয়ে করেছে আমার স্ত্রী। অনাকার অন্ধকার কাকড়াইল জুড়ে, গাছগুলি অবগুণ্ঠিত, পিছনে গাড়ির সার, পুত্র আর স্ত্রীকে নিয়ে আমি ঘরের দিকে। নিজের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি মনস্তাপ,

নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ চিৎকার ঃ হানাদার বাহিনী শুধু দখলদারই নয়, জাতিগত বিদ্বেষের যন্ত্রও, ভাষা তাদের কাছে তাই জাতিগত শ্রেষ্ঠতার সংকেত। তুলনীয় কি এদের সঙ্গে হিটলারের জার্মানি ? না বোধ হয়। ইহুদিরা কি নেহাৎ ভাষার জন্যই হত্যার খোরাক হয়েছে ? আমার উত্তরাধিকারে এখন এসে যাচ্ছে ইহুদিরা, জর্মানি কবলিত ফরাসিরা, ফ্রাঙ্কোর স্পেনিয়ার্ডরা; এসে যাচ্ছে ফাঁসীর কাঠ আর হত্যা; এসে যাচ্ছে ঘরছাড়া স্বপ্ন; এসে যাচ্ছে বিতাড়িতের লেলিহান ঘৃণা ঃ যদি পোড়ানো যেতো দুর্গন্ধের প্রত্যহ, যদি হন্তারকের হাত থেকে মুক্তি পেতো আমার দিন আর রাত।

সকালে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে, দুপুরে অফিসে, রাত্রে ভিন্ন কোথাও, এভাবেই আমার সময় যাপন। কতোদিন এভাবে থাকতে হবে কে জানে! রাত্রে হয়তো আজুদের ওখানে, থেকে থেকে ঘুম বিদীর্ণ শব্দে, আঁতকে উঠি, কড়া কি নাড়ছে কেউ ? আমার জন্য আজুদের না বিপদ হয়। ভোর হতেই ছুটি স্ত্রী পুত্রের খোঁজে, আমার জন্য ওদের ওখানে তো হানা দেয়নি ! আমার ছেলে আমাকে দেখে কেঁদে ওঠে ঃ তুমি কেনো রাত্রে থাকো না, আমার ভয় করে। কোন জবাব আমার জানা নেই, আমার হৃদয়ে স্ত্রী পুত্রের যন্ত্রণা আর আর্তি আর ভাবনা; যে-সব জায়গায় রাত কাটাই তাদের সবার ভাবনা আর আর্তি আর যন্ত্রণা; আমার হৃদয়ে দুঃখের আবর্ত, কান্নার অনল; আমার হৃদয়ে উদ্বাস্তু স্বদেশ। আমি কোথাও নেই কিংবা সবখানে আছি; আমার উপস্থিতিই সর্বনাশা; আমাকে আশ্রয় দিতে সবাই উন্মুখ, সেই সঙ্গে আতঙ্কে বিহ্বল। এই প্রথম মৌল মানবিক বৃত্তি আমাকে গ্রাস করছে, মনে হচ্ছে প্রেম সত্য, ভালোবাসা সত্য, জীবন যাপনে জরুরি, দরকার। আগে মনে হতো প্রেমের কবিতা আমার অস্তিত্ব সংলগ্ন নয়, কিংবা প্রেমের গল্প অন্য কোন ব্যক্তির ভুবন। সকালবেলা আজুদের ঘর থকে যখন বেরোই বুকে নিয়ে ফিরি আজুর উৎকণ্ঠ, বাসায় এসে দেখি ছেলের চোখে সেই উৎকণ্ঠা, স্বচ্ছ আর অন্তলীন, আর উপস্থিত, নিরন্ত ফিরে ফিরে বারে বারে, শেষ নেই।

বিকেলে আজিমপুর, জানাজা যাচ্ছে। খাটিয়ায় চাদর ঢাকা শব, জনা আটেক লোক পিছু পিছু। দুপাশের বাড়ির জানালা বন্ধ, রাস্তা খালি, শুধু ঐ কজন বাদে, হেঁটে যাচ্ছে দ্রুত। জবাব জানি, তবু প্রশ্ন; কি হয়েছে ? গুলীতে মারা গেছে, পাড়ারই ছেলে। কাঁধে লাশ নিয়ে তারা যাচ্ছে, নাকি বন্ধু সহকর্মী, দ্রুত তারা যাচ্ছে গোরস্তানে। কার কথা ঃ কদম কদম এগিয়ে যান, ডাইনে গেলেই গোরস্তান। মনে পড়ে না, কবে পড়েছি কোথায়। মনে পড়ে না, কবে এই গোরস্তানে এসেছিলাম আর কারো জন্য। আমরা সবাই কি এগিয়ে যাচ্ছি গোরস্তানের দিকে, আস্তে আস্তে, অমোঘভাবে ?

এসে শুনি ডক্টর শরীফকে (আহমদ শরীফ) খোঁজ করছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সাইক্লোস্টাইল মেশিনে কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মার্চের গোড়ার দিকে ঐ মেশিন আমরা ব্যবহার করেছি। স্টেনসিল নষ্ট করতে কি ওরা ভুলে গেছে ? নাকি

ভেতর থেকে কেউ খবর দিয়েছে ? মামুনের জন্য ভয় করছে আমার। ওকে অন্য কোথাও, খুব সম্ভব লিলির ওখানে পাঠিয়ে দিতে হবে। মামুন যুক্ত মার্চের প্রতিরোধে; মামুনের বন্ধুরা, ডক্টর শরীফ, আমরা সবাই। একজনকে খোঁজ করার অর্থ সবাইকে খোঁজ করা। কোথায় যাবো, কোথায় কাকে লুকোবো ? চেনা শহরটায় লুকোবার জায়গা নেই। অসহায়, নিজের মুখোমুখি অসহায় আমি; হতাশার ভারে ক্লান্ত আর অবসন্ন। দশ মিনিট বাদে কারফিউ শুরু হবে। চেনা শহরটার কোনো রাস্তাই কোনো গন্তব্য মেলে ধরছে না, রাস্তাগুলি চিৎ হয়ে আছে আকাশের তলায়, আর আকাশটা জ্যোৎস্নার অরণ্য।

কেনো জানি একটা ইচ্ছে জাগছে ভেতর থেকে ঃ টিকে থাকতে হবে। জীবনকে তাই আকড়ে ধরছি, কোন কিছু যাতে দ্রুত না ফুরোয় ঃ জামা, জুতো, আশা কিংবা বিশ্বাস। কৃপণের মতো খরচ করছি, আস্তে আস্তে, রেখে রেখে। কতোদিন এই নরকে থাকতে হবে জানি না, কিন্তু ঐ সব যেনো না ফুরোয়, শেষ পর্যন্ত আশা আর বিশ্বাস যেনো টিকে থাকে, শেষ পর্যন্ত দেখে যেতে হবে। সেই সঙ্গে গান শোনার দারুণ ইচ্ছে করছে, ইচ্ছেটা অভাববোধ, অনেকটা শারীরিক যন্ত্রণার মতো। যদি গানের কাছে ফের ফিরে যাওয়া যেতো, লাবণ্যের আর আবেগের কাছে। সম্ভব নয়, এখন সম্ভব নয়, শব্দ ডেকে নিয়ে আসবে বিপদ।

অন্ধকারে চোখে ফোটে পিপঁড়ে, দেয়ালে সার বেধে চলছে। বাতি নেভানো ঘরে ক্ষীণ লাল বিন্দু দেয়ালের শাদায়, পিঁপড়ের সংসারে ব্যস্ততা, হয়তো ঘর গুছোবে, প্রতিপালন করবে নাগরিকদের; আর আমরা মানুষের সংসারে এখন ঘর গুছোতে অক্ষম, নিজেদের প্রতিপালনে ব্যর্থ, আমরা অনাথ, আমাদের কোলে অন্ধ সেতার; কবে দেখা দেবে পাল তোলা নৌকো, দূরে দিগন্তে !

৬

খবরের কাগজ পড়ার অযোগ্য ঃ বমি উগড়ে আসে, মেজাজ বিগড়ে দেয়। ঐসবে মানুষের স্বর অনুপস্থিত। খবর একই শব্দে বানানো একই মিথ্যা বলার জন্য। মানুষ নেহাৎ সহ্য করে চলে, সামরিক সরকারের কোনো চিহ্ন তাদের হৃদয়ে নেই। খবর এখন অতিপ্রজ, অসংলগ্ন, নির্বাচনহীন, ভয়াবহভাবে পুনরুক্তিবহুল। শুধু সত্য উর্দিপরা পা জানালার ওপাশে আর মৃত্যু ঘরের মধ্যে। আমি মুখোমুখি জীবনের মোড়ে, কি উপার্জন করেছি তার জন্য নয়, কি হারিয়েছি তার জন্য। নিজের মধ্যে বেড়ে উঠছে শক্তি আর সাহস, সীমাহীন আর গভীর। হয়তো ঐ কারণে বেঁচে থাকা সহজ হচ্ছে। সবকিছু থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো সাহস আমার নেই। ভালোবাসা জীবন, কান্না, রোদ; জীবন যেভাবে বুঝি সেইভাবে মিশে যাচ্ছে পরস্পর হতাশা আর ভালোবাসার শক্তি। এখন তো হাঁ এবং

না-এর মধ্যে কোন বিরতি নেই। এখন হ্যাঁ এবং না একসঙ্গে। না এবং বিদ্রোহ সবকিছুর বিরুদ্ধে যা রোদের বিপরীত। হ্যাঁ জীবনের জন্য, ঢাকার জন্য, বাংলার জন্য। যেন ক্ষীণ বঙ্কিম পথরেখা অরণ্যে; যেন লৌকিক বা আলৌকিক সংসর্গ। পোড়া, বিশৃঙ্খল মাস, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের বদলে অতীত আর আমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। ঐ আমার সম্পদ; ঐ ভাবে নির্মিত হচ্ছি আমি; যুগপৎ আবহমান বাঙ্গালী আর ভৌগোলিক বাংলাদেশ আমার মধ্যে সূচিত হচ্ছে; আমি বাংলার আক্ষরিক অর্থসংগ্রহ। আমার শক্তির চেতনা, আমার হৃদয়ের ঘৃণা, আর চোখের স্বচ্ছতা নিয়ে নিয়তির মুখোমুখি আমি।

সবজি বাজারে ফের মিলছে; মাছ মাংসও। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি, মন খারাপ করা। সিনেমার অভাব বোধ করছি, কতোদিন সিনেমা দেখি না। ডাক চলাচল ফের শুরু হয়েছে। কাকে চিঠি লিখবো ? ডলিকে ? বেঁচে আছে ? যার কথা মনে পড়ে একই শব্দ ধ্বনিত হয় ঃ বেঁচে আছে ? সেজন্য আর চিঠি লেখা হয় না।

এখন সবকিছুর জন্য চড়া দাম দিতে হচ্ছে, এমনকি আশার জন্য। আমার এক আত্মীয়, যশোর ক্যান্টের প্রশাসনিক অফিসার, তাকে মেরে ফেলেছে। সংসারের একমাত্র উপার্জনের যন্ত্র, ভাই বোন বেশ কটি, বুড়ো বাপ পাগল হয়ে গেছে। দুলালের মুখে শোনা, চৌদ্দদিন হেঁটে চট্টগ্রাম থেকে এখানে পৌঁছেছে। বড় ভাইরা কেমন ? কাজলরা ? জবাব ঃ ঠিক জানি না। বেঁচে থাকা এখন অনুমান নির্ভর।

ঝুনুরা উঠেছে বেনুদের বাসায়। অফিসে যায়, ফিরে আসে। ভয়ের মধ্যে আছে। ওপরআলা কৈফিয়ৎ তলব করেছে। নোয়াখালী বদলি করা হয়েছে, যাচ্ছে না কেনো? কিন্তু যাবে কি করে ? যোগাযোগ অনিশ্চিত। মার্চের অসহযোগের সক্রিয় কর্মী, ধরে নিয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে বেশ দালাল জুটেছে। নাম তৈরি করে দিচ্ছে। একজন তো বলেছে ঃ মানুষ নয় পাট চাই। কর্মচারিটি দক্ষতার জন্য কীর্তিমান, সব রাজত্বেই ইনাম সংগ্রহ করেছে। আমলাতন্ত্রের কি দেশপ্রেম সম্ভব? না বোধ হয়। চিরকালই তারা সরকারভোজী দ্বিপদজীব। বেনুরা কালিহাতীতে, শুনছি সেখানে যুদ্ধ চলছে।

চারপাশে বাতাসের নরম দেয়াল। মেঘেরা উড়ছে চোখে, কমলা রোদ বুড়িগঙ্গায়। বহুদিন বাদে নদীর কাছে এসেছি, এমনিতেই। এখনও রোববার হাতছানি দিয়ে ডাকে, পড়শিদের মাথা স্বপ্নের মতন, রাস্তাটা গল্পের বইয়ের মতন; তাই নদীর কাছে। নদী নাকি নদীরা কোলাহল করছে নৌকোয়, ঘুরেঘুরে এখানে, তাই ভাবছি। একটি সিপাহী দাঁড়িয়ে, একা, রাইফেল হাতে; রগ ফুলে উঠছে ঘাড়ে। চোখে নির্লজ্জ কৌতূহল, দেখছে বাংলাদেশ।

ফেরার সময় ডক্টর কাজী দীন মোহাম্মদকে দেখলাম। হেঁটে যাচ্ছেন দ্রুত। আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। রেডিও এবং টেলিভিশনে যা বলেন তা কি বিশ্বাস করেন ভদ্রলোক ? পাকিস্তানের রক্ষক রাস্তায় একা, চারপাশে বাংলাদেশ। ঐ

পরিস্থিতিতে কাউকে দোসর হতে হয় কিংবা যুদ্ধ করতে হয়। সরে দাঁড়ানোর উপায় নেই, জীবন দায়িত্বে গেঁথে যাচ্ছে। মতাদর্শ নিয়ে লড়াই করার সুযোগ আগে ছিলো না। এখন মতাদর্শ জীবন, বেঁচে থাকা, ভিত্তি ও ভূমি। ডক্টর দীন মোহাম্মদ তাঁর নিয়তি বেছে নিয়েছেন। চারপাশের ঘটনাবলী থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। তাঁকে বেঁচে থাকতে হলে পাকিস্তানের মধ্যে থাকতে হবে। বাংলাদেশে তাঁর স্থান নেই। সেজন্য, স্বাধীনতার ব্যক্তি অর্থ হচ্ছে এখন কাজ করা। আমরা এখন যুদ্ধের মধ্যে; আমাদের বিচার করার অধিকার আছে। বিচার করা এবং কাজ করা। পক্ষ ও বিপক্ষ চিনে নেয়া।

খিদে পেয়েছে। নানকিংএ গাড়ি পার্ক করে এলাম ভেতরে। টেবিল ভর্তি সামরিক বাহিনীর অফিসার। খাচ্ছে, হো-হো করে হাসছে। কোথাও কোন খেদ নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। কোণার টেবিলে বুসকে বসেঃ হেসে জিজ্ঞেস করলো ঃ কেমন; আস্তে আস্তে জানালো ডেইল টেলিগ্রাফ এবং এ.এফ.পি'র স্থানীয় সংবাদদাতা হয়েছে সে। দরকার মতো যেনো যোগাযোগ করি। পাশের টেবিলে একজন সামরিক কর্তা, সঙ্গে দুজন বাঙ্গালিনী; উর্দু এবং ইংরেজি ছিটোচ্ছে।

খুব সম্ভব শ্রাবণে নাকি আশ্বিনে। স্মৃতি উপযুক্ত ঋতু তৈরি করেছে। আমরা ভাইবোনেরা বাড়িতে সুখী। সবাই এসেছে। তখন কে জানতো আমরা সবাই অমন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো ? কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, করাচী; ভাই আর বোনেরা ছড়ানো; মধ্যে যুদ্ধ, দূরত্ব। ফের কি আমরা সবাই একত্র হতে পারব ? আম্মা, যিনি কেন্দ্র, তিনি নেই, কবেই মারা গেছেন। একজনকে ঘিরে সবাই থাকে। ব্যক্তির জন্য ঐ সত্য। দেশের জন্যও তাই, মানুষের মন মরে গেলে দেশ থাকে না।

আজ থেকে থেকে মনে পড়ছে ফুল, নদী, মৌমাছি, মানুষী শরীরের ভাষা ঃ চোখে রোদ ও ছায়ার কারুকাজ; গলার যন্ত্রণা উন্মুখ সুন্দর; রোদের ভোর; গান ঝাঁট দেয় শব্দ; কিংবা পাখির স্বপ্ন কিংবা বৃষ্টি। সকল কোলাহলের মধ্যে স্তব্ধতার সংরক্ষণ করা আমার ব্রত। উন্মুখ এবং শান্ত থাকা, উর্বর অন্ধকারে বৃষ্টি পড়া, ফসল পেকে ওঠা, এভাবেই সঞ্চয়করা পৃথিবীর বোধ আর শরীরের বেঁধে, এভাবেই গড়ে তোলা শান্তি। ঐ শান্তি শিশুর হৃদয়ে ধুকধুক; অনবরত, অনর্গল, যুদ্ধের আর হত্যার মধ্যে।

শহীদল্লা কায়সারের সঙ্গে দুদিন আগে দেখা হয়েছে। মতিঝিলে তাঁর অফিসে গিয়েছি। জিজ্ঞেস করার অনেক কথাই ছিলো। কি তিনি ভাবছেন, কি করা যায় ঐসব। জানালার বাইরে আকাশের অনেকটা, তোলপাড় তোলে ছুটছে জেট। দূরে একটি বাড়ির ছাদে পাকিস্তানের পতাকা, বাতাসে আর রোদে ক্ষয় ধরেছে। খুব কিছু বললেন না তিনি। শুধু যাবার স্বয় বললেন ঃ অসুবিধে হলে সোভিয়েট কনস্যুলেটে যেনো হাজির হই। রাস্তায় বেরিয়ে ভাবলাম, ঐ ভবন পর্যন্ত পৌঁছানো কি সম্ভব রাত্রে, কারফিউতে, বাড়ি ঘেরাওর সময় !

শহীদ কাদরীর সঙ্গে দেখা। টেনে নিয়ে গেলেন তণার বাসায়, বোনের সঙ্গে আছেন। এ্যালিফেন্ট রোডে নিউ মার্কেটের কাছে বাসা রাস্তার ওপর। সবে বিকেল,

ঘরের মধ্যে আবছায়ার কারুকাজ। আস্তে আস্তে বললেন ঃ আমি বিয়ে করেছি। দু'বাড়ির কেউ জানে না, লুকিয়ে। এ টাইম টু লাভ এন্ড এ টাইম টু ডাই; যদি বেঁচে না থাকি শেষ পর্যন্ত।

বাসার দিকে ফিরছি। মাথার মধ্যে গুনগুন করছে ঐ কথা কটি ঃ এ টাইম টু লাভ এন্ড এ টাইম টু ডাই। সেই সময় এসে গেছে ঃ জীবন থেকে যা নেয়ার নিয়ে নেয়া ভালো। পরে হয় তো সময় থাকবে না। পরে হয়তো কিছু থাকবে না। সর্বনাশ চতুর্দিকে, আস্তে আস্তে গ্রাস করে নেবে সবাইকে। থাকবে কেবল পোড়োজমির বাসিন্দারা। কিন্তু সে কি হয়, কখনো হয়?

৭

বর্তমান আর আমাদের বর্তমান নয়?

বিষণ্ন প্রতিবেশী, খালি রাস্তা, হতচ্ছাড়া দরজা, লুণ্ঠিত স্বপ্ন, সবকিছু ভারাক্রান্ত, সেইসঙ্গে সম্ভাবনাময়। কিন্তু কিসের? বাড়ন্ত গাছের মতো কোন দিকে উত্থানসক্ষম? এ প্রশ্ন শব্দে ভরা, স্বপ্ন আর বীজের চিৎকার ভরা। চারপাশে ঢাকা শহর গ্রীষ্মের যত্নে উর্ধমুখ হচ্ছে, সে কি সূর্যের দিকে, আনীল আকাশে? ভোরবেলা, যখন বাসের শব্দে ঘুম ছিঁড়ে আর জানালায় বাড়ি মারে সদ্য রোদ; দুপুরে যখন শব্দের মধ্যে বাজে নিঃসঙ্গতা আর চোখে ফোটে আতঙ্ক বিকার বিভ্রম; সন্ধ্যায়, যখন কানে আসে শব্দহীন বিলাপ গুঞ্জন আর ঘরে ঘরে ক্লান্তি আর মৃত্যুর সন্ধির লগ্ন, তখনও ঐ স্বপ্ন উপকারী, মৌলিক, অপেক্ষমান; এভাবেই ঢাকা শহরটা আমাকে জড়িয়ে ধরছে। চোখে মুখস্ত রাস্তা, আর চোখে মর্মরিত রাস্তার গর্জন; গাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে তোপখানার বাঁক, রমনার কোণার বহু বিস্তীর্ণ বৃক্ষের উল্লাস, ঘোড় দৌড়ের মাঠের শান্ত সোনালী, তখন কে যেনো কেঁদে উঠলো, কে কে? বর্ধিত বাতাস ঐ কান্নাকে তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিলো চতুর্দিকে, আমার বুকের মধ্যে ঢাকা শহরটা কাঁদছে।

আব্বার সঙ্গে আমার মানসিক দূরত্ব বেড়ে চলেছে। যৌবনের দিনগুলি তিনি খরচ করেছেন পাকিস্তানের নির্মিতির জন্য। পাকিস্তান তাঁর কাছে আদর্শ কিংবা স্বপ্ন, এক সময় ঐ সব জপিয়েছিল দিনে দিনে বাঁচার মন্ত্রণা, সেজন্য তিনি বিশ্বস্ত ঐ আদর্শে, সেইসঙ্গে বর্তমানের হত্যা আর মৃত্যু তাঁকে ব্যথিত, যন্ত্রণা দগ্ধ করে তুলেছে, তাঁর মনে চলছে যুদ্ধ, আদর্শের সঙ্গে যুদ্ধ, অন্তত সংলাপ। পাকিস্তানের এই পরিণাম তিনি চান না, পাকিস্তান ধ্বংস হোক তিনি চান না বরং আদর্শের মধ্যে পাকিস্তান সত্য হোক। আশি পেরোনো আব্বাকে কি করে বোঝাই তা আর সম্ভব নয়, আদর্শ মরে গেছে, স্বপ্ন লুপ্ত, এখন শুধু সম্পর্ক শাসন আর শাসিতের, করোনির সঙ্গে মেট্রোপলিটান সাম্রাজ্যের, এখন যুদ্ধ স্বাধীনতার। তাঁর অর্জিত উদ্যম এখন তাঁকে নিংড়ে ফেলেছে, তিনি নিশ্চিত নন কার সংস্পর্শে উদ্ভাসিত ঃ আদর্শের কি হস্তানকের,

তাঁর আদর্শের পাকিস্তান এখন হন্তারকে পরিণত, তিনিও মরে যাচ্ছেন গোপনে, নেপথ্যে, আড়ালে; তাঁর আদর্শ নাকি স্বপ্নের ঘনত্ব গলে গিয়ে সৈন্যদের আগাছা, রক্তের নর্দমা, বেলেল্লা বস্তি হয়ে উঠছে, অসহায় হয়ে দেখছেন পাকিস্তানের লুপ্তি। আসলে এ-ই হয়, রাষ্ট্রের মধ্যে অবিরল বর্ধমান, বিপজ্জনকভাবে অন্তশীল, উপস্থিত আদর্শের মৃত্যু ঃ আদর্শে উৎসাহপ্রবণ ব্যক্তিদের তখন দেয়ার কিছু থাকে না, যন্ত্রণায় দগ্ধ হওয়া ছাড়া। আব্বা দেখছেন ঃ যৌবনের দিনগুলি আর বর্তমানের দিনগুলি, সেতুবন্ধন সম্ভব নয়; তাই কি শান্তভাবে সহ্য করছেন পাকিস্তানের মৃত্যু, আমার যুক্তি আর তর্ক;সহ্য করছেন তাঁর যৌবনের দিনগুলির সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ ?

গাড়িতে মীরপুর রোডে, পাশে প্রতিবেশী, হঠাৎ বললেন ঃ দেখুন। কাকে ? ঐ যে বাসে, জানালার পাশে। এক লোক, সূঁচলো দাঁড়ি, মেহেদী মাথা, চেয়ে আছে বাইরে। প্রতিবেশী ফের ঃ পেশায় ইমাম, একশো বাঙালীকে নিজের হাতে জবাই করেছে। যেনো প্রচণ্ড ধাক্কা চেতনায়, একজন মানুষ জবাই করেছে তারই চেনা মানুষদের, ধর্মের নামে কিংবা আল্লাহ্‌র নামে! তা-ই হচ্ছে এখন, রাষ্ট্র মানুষকে পশুর অনুগামী করে তুলেছে, শিখিয়েছে বাঙালী মানুষ নয়, সে কাফের, মনুষ্যত্বের বাইরে। নিজের হাতে জবাই করে সে অর্জন করছে সওয়াব, বেহেস্তের ঘর, তার ভাবনায় তাই কোন মনস্তাপ নেই, যাতনা নেই, সে উদ্ভাসিত অনন্তে, প্লাবিত অচিন্ত্য পুলকে; রাষ্ট্র এভাবে তাকে করে তুলেছে অমানুষ, চিন্তনরিক্ত, মনুষ্যত্বের পরিত্যক্ত; ঐ রাষ্ট্র ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক। আমি, একজন মানুষ, মানুষিক মমত্বে বিব্রত; আর ঐ একজন, সেও মানুষ, নির্মুক্ত, নিঃশঙ্ক, পূণ্যময় অমরত্বে ধন্য; ঐ নগ্ন নির্দয় অসম্ভব বাস্তব করছে পাকিস্তান, বাতাস ও নিসর্গের শব্দে এনেছে চিৎকার, রাত্রি আর অন্ধকারে আর্তি, রোদ আর দিনের মধ্যে শূন্যতা; দেখিনি কোনো আল্লাহকে; শুধু জানি, ঐ এক মানুষ আমার মনুষ্যত্ববোধ করে দিচ্ছে লজ্জিত, মনে জাগছে স্পষ্ট মানুষ আর ধর্মান্ধের কোথায় ব্যবধান। বাসটি চলে গেলো, আর দ্রুতগতি উদ্‌ঘাটিত করে দিলো আমার হৃদয় ঃ স্বাধীন, সঙ্গহীন ও অসহায়।

সেজন্য নান্নী যখন জানালো সে লন্ডন চলে যাবে, মানা করতে পারিনি। আট বছর সঙ্গে আছে, অথচ এখন বলতে আমি অক্ষম ঃ তুমি থাকো, কিছু হবে না। অর্তক্য তাই তার ইচ্ছা; সে চলে যাক, অন্তত কেউ তো বাঁচবে, একজন মেয়ে তো বাঁচবে তার সকল আসক্তি, উদ্যম, আশা, সুখ নিয়ে; তার মধ্যে ফের গড়ে উঠবে হৃদয়ের ক্ষমতা। ঢাকা এখন দুঃখ, ঢাকা এখন সর্বনাশ; লন্ডন কিংবা নিউইয়র্ক কিংবা কলকাতা এখন সবাইকে চায়, শুধু দেশেই তাদের আশ্রয় নেই। দেশ ? সে কোথায়, কোন সুখে, অভিজ্ঞতায় লুকানো ? সে কি স্বপ্নে আবৃত, শ্রুতিতে অন্তর্হিত ? দেশ এখন দেশান্তর, অপহৃতা, চিরন্তনী, দুঃখিনী; নাকি শস্যকণা, কিংবা অন্ন, অজস্র অবহমান, কি জানি, জানি না। নান্নী কিছুদিন বাদে চলে যাবে, মুন্নীর তাই মন খারাপ, যেনো বলে ঃ দোষী আমি, ঠেকাতে পারি না সর্বনাশ; বোন চলে যাচ্ছে দূরে,

ভিন্ন দেশে, কবে ফের দেখা হবে কারো জানা নেই কিংবা আমরা তখন মৃত, আমদের খুঁজে পাবে না, শুধু থাকবে অন্ধকার, বিচ্ছুরিত সর্বত্র, আর বৃষ্টি রোদ বৃক্ষ সমীর ঋতুচক্রের সম্মতি মেনে।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেলো, লিলি দাঁড়িয়ে। মুখ শুকনো, চুল অগোছালো। কি ব্যাপার ? কাল রাতে পাড়ায় হানা দিয়েছে। লিলি ফের ঃ ছেলে দুটিকে শিখিয়েছি হানা দিলেই আমাকে ধরে আম্মী আম্মী বলে চেঁচাতে, যদি তাতে ছাড়া পাই। কিছু বলার নেই, বেঁধানো সূচের মতো অনুভূতি, রক্ত আর যন্ত্রণা ঝরছে। যুবতী মা বাঁচবার পথ আবিষ্কার করেছে, অবস্থার অস্থৈর্য পেরিয়ে, নিরস্ত্র হাতে ঠেকাবার চেষ্টা করছে নিজেকে। বিকেলটা নীল, আকাশের কপাট খোলা, হঠাৎ বাতাস আমগাছটায় নীল মেখে দিচ্ছে, ঘর ভর্তি বই, ঐ সব বিপজ্জনক শব্দের মধ্যে বোনের মুখোমুখি আমি। লিলি ফের ঃ আমার অফিসের একটি ছেলে, মতি, মতিউর রহমান আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। বলবো ? হ্যাঁ। কবে ? কাল বিকেলে, এখানে। মনে মনে কথা সাজালাম ঃ অস্তিত্বটা এখন পড়ো ঘর কিংবা নদীর পাড়, তবু ফুল ফোটে বাঁশী বাজে; অস্তিত্বই সর্বস্ব এখন, অন্য কোনো সূত্র নেই, সেতু নেই। আর অস্তিত্ব ঃ তার মানে এখন বুকের মধ্যে উত্তাল ঢেউ, বাতাসের ঝাপটা, শষ্যের স্তব্ধতা।

এলিফ্যান্ট রোডের মোড়, জয়নুল আবেদীন দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যার অন্ধকারে। গাড়িতে তুলে নিলাম তাঁকে; রাস্তায় বাতি নেই; তিনি বললেন আস্তে আস্তে ঃ কিছু একটা করতে হয় য়ুনিভার্সিটির ব্যাপারে। আসুন না কাল দুপুরে, আলাপ করা যাবে। কথার অধিক এসবঃ সপ্রাণ মুহূর্ত। ধানমন্ডির এক বাড়িতে তাঁকে নামিয়ে আমি ফের আমার আশ্রয়দাতার ডেরায়। এসে দেখি ঈসা বসে, ছাত্র, আত্মীয়, ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্য। চোখ নিচু করে জানাল ঃ ইসলামী ছাত্র সংঘ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা তৈরি করছে, নাম আছে তার মধ্যে কবীর চৌধুরীর, আমার, আরো, অনেকের। অভিযোগ ঃ রাষ্ট্রদ্রোহীতার, বিজাতীয় আদর্শ প্রচারের। জিগগেস করলাম ঃ কি করবে তুমি ? ঈষৎ চঞ্চল সে ঃ ছেড়ে দিয়েছে সংঘ। বেঈমানী নয়। দেশ কি এভাবেই দাবী করে তার সহকর্মীতা, প্রস্তুতি ? এভাবেই তৈরি করে রূপান্তর ?

জানালার পরপারে রাস্তা ; দূরের ফ্ল্যাটের ছেলেটির চিৎকার শোনা যাচ্ছে ঃ জঙ্গীরাজ মুর্দাবাদ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। বাবা এসে ছেলেটির মুখ চেপে ধরেছে; ছেলেটির মাথা পঁচিশে মার্চ থেকে খারাপ হয়ে গেছে, থেকে থেকে চেঁচায় আর গালাগাল করে। ওকি চিৎকার, না তূর্যনাদ; চিরকাল আরম্ভ, চিরকাল অসমাপ্ত।

৮

গরম, ঘাম নিংড়ে বের করছে, জানালার বাইরে সকাল হাত বাড়ালেই নদীর মতন আঙুলের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবে। নদী, নীল চঞ্চল, নাকি ঢেউ ঝাপসা দূর; মুখ আমার

ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। একটু পরে রোদ উঠবে, কড়া মদির মারাত্মক; স্পষ্ট হবে শহরের নানা অংশ; রাস্তায় চলাফেরা করবে খালি পা ক্লান্ত পা উর্দিপরা পা, ঢাকার রাস্তায়।

আজ মেলা কাজ আমার। কবীর চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, খবর পাঠাতে হবে ডক্টর শরীফের কাছে। কবীর চৌধুরীকে টেলিফোন করা সম্ভব নয়, টেলিফোন ট্যাপ হবে। তাহলে ? ডক্টর শরীফ কোথায় আত্মগোপন করেছেন জানি না। কিন্তু খুঁজে বের করা জরুরি। মনসুর মুসার সঙ্গে ডক্টর শরীফের সম্পর্ক অন্তরঙ্গ। মুসাকে কোথায় পাই ? তাঁর স্ত্রী নাহার মুসলিম কমার্সিয়াল ব্যাঙ্কের মহিলা শাখার ম্যানেজার। ওখানে কাউকে পাঠানো দরকার। কিন্তু কাকে ?

ঐ সব ভাবনা নিয়ে অফিসে। রাস্তায় দেখলাম ট্রাক, ট্রাক আর ট্রাক ভর্তি সৈন্য দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। এক নজর; পরের মুহূর্তেই চোখে ভেসে উঠলো গত রাত্রের খবর। সৈন্যরা খুঁচিয়ে মেরেছে বেয়নেট দিয়ে সেই বোকা মানুষটিকে মসজিদের নামাজ পড়তে গিয়ে যে আর ফিরে আসেনি। সেই মানুষটি কি বেহেশতে যেতে পেয়েছে ? কিংবা সেই সৈন্যরা কত সওয়াব অর্জন করেছে ?

টেলিফোন করলাম জাহানারা ইমামকে। কার্নিশে দুটি পায়রা; আর কাগজের কুচি।

একটু দরকার আপনার সঙ্গে।

আসুন বাসায়।

না।

তাহলে ?

আপনার স্বামীর অফিসে।

কখন ?

দশটায়।

ঠিক আছে।

টেলিফোন কেটে দিলেন মহিলা। একটু বাতাস, রোদ বোধ হয় কেঁপে উঠছে। মনে পড়ছে বাতাসের শব্দ, পাতার শব্দ, গাছের শব্দ। মনে পড়ছে বোকা লোকটিকে। মনে পড়ছে কিছুই না।

গাফফার (আবদুল গাফফার চৌধুরী) নেই। হাসান (হাসান হাফিজুর রহমান) লুকিয়ে আছেন। শামসুর রাহমান, ফজলের (ফজল শাহাবুদ্দীন) খোঁজ জানি না। শুধু শুনি সবাই চলে যাচ্ছে। কেউ কি থাকবে না শেষ অবধি ? নেতৃত্বহীন সাধারণ মানুষ নেকড়ে আর হায়েনার মুখোমুখি। মানুষকে বাঁচাতে হবে আশা আর বিশ্বাস দিয়ে; আশা সঞ্চারিত করতে হবে মন থেকে মনে, বিশ্বাস জ্বালাতে হবে শিখার মতন হৃদয় থেকে হৃদয়ে; আমরা যারা লিখি আমরাই চিরকাল মানুষের, তাদের কান্না আর চিৎকার আর লড়াই আমাদের হৃদয়ে আশ্রয় খোঁজে, আমাদের আশ্রয় মানুষের হৃদয়ে, আমরাই থেকে যাব চিরকাল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানষের প্রতিদিনে

প্রতিরাতে প্রেমিকের উন্মুখর আশা আর যন্ত্রণা নিয়ে। আমরা এখানের, এখানেই সংগ্রামের বিষাদ কিংবা বীজকম্প্র স্তব্ধতা ব্যাপ্ত করতে হবে; হৃদয়ে মানুষ আর ছিন্ন হৃদয়ে মানুষের আর্তি; দুচোখে মানুষের কান্না আর মানুষের দীপ্ত গর্ব, এই মৌন এখানেই গড়তে হবে নিজ বাসভূমি। আকাশটা পাহাড়ের ঘন শিখরের মতন, শাদা নীল আর উজ্জ্বল; আকাশটা নগ্ন আর শানিত; আকাশটা পাখিদের কান্না।

ঠিক দশটায় শরীফ ইমামের অফিস। জাহানারা ইমাম এসে গেছেন। মহিলা হেসে বললেন, কেমন আছেন ?

ভালো। কাজটা শেষ করি।

বললাম বুঝিয়ে। দুটি চিঠির একটি কবীর চৌধুরীর অন্যটি নাহারের, পৌঁছে দিতে হবে। কবীর চৌধুরীর বিষয় ঃ তিনি যেন সতর্ক থাকেন। নাহারের বিষয় ঃ মুসা যেন যোগাযোগ করে ডক্টর শরীফের সঙ্গে। উদ্দেশ্য একটাই ঃ যে কজন আছি আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে।

অফিসে ফিরে এসে জেরোম কুইয়ার সঙ্গে দেখা; এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। বাঙ্গালী খৃষ্টান, দশাসই চেহারা। বললেন ঃ স্ত্রী পুত্রদের রাঙ্গামাটির কাছে রেখে এসেছেন, শহর নিরাপদ নয়। রাঙ্গামাটি আড়িখোলার অনতি দূরে, খৃষ্টান বসতি। সৈন্যরা সেখানে হাজির, গির্জা আর গ্রাম পোড়াচ্ছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হায়রে বাংলাদেশে কেউ আর নিরাপদ নয়, মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, কিংবা বৌদ্ধ যেই হোক। কুইয়া সাহেবের বুকে ঝোলানো ক্রশের লকেট; যিশুখৃষ্ট ফের ক্রশবিদ্ধ বাংলাদেশে, যিশুখৃষ্ট নিজেই ফের হন্তারকের শিকার, বারে বারে ফিরে ফিরে এই হয়, এই হতেই কি থাকবে চিরকাল ?

আমরা এখন ইতিহাসের মুখোমুখি। সেজন্য মানুষ হিসেবেই আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। অন্তিম বিশ্লেষণে মানুষকেই সকল সমস্যার সুরাহা করতে হয়, যে সব সমস্যা সে নিজেই তুলেছে। সত্যের প্রেমিক হওয়ার অর্থ হয় তো সত্য থেকে দুঃখ না পাওয়া। সেই সাধনার দরকার এখন।

মনে হচ্ছে বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, চুল হঠাৎ হঠাৎ শাদা। গলায় বয়েসের ভার, টের পাচ্ছি। আগর মতন সতেজ কিংবা উদ্দীপ্ত নয়, হয়তো অতিরিক্ত ভাবনার জের, কথা বলতে এখন কষ্ট হয়। আর কথা ? নিষিদ্ধ নাকি বিদ্রোহী; নিষিদ্ধ বলেই মনে মনে, বিদ্রোহী বলেই মনে মনে, সারাক্ষণ সংলাপ, অফুরন্ত অনর্গল, নিজেকে ঐভাবে আবহমান করে তুলি। ভাবনাগুলি নমিত, কম্পমান, কবোষ্ণ, নীল ছেঁড়া পাখির মতন। মৃত্যু জানি ভাবনার মধ্যে সর্বক্ষণ, ঘিরে ধরছে, তবু ঐ পাখির মতন ওড়া ডানা মেলে দেয়া ভেসে চলা সাহস জোগায়, ঐ সাহস মন স্বচ্ছ করে তোলে ঃ স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন, হিরন্ময় আর নিরুপম; আর সখ্যে মমতায় সংযত।

জয়নুল আবেদীনের ওখানে। তিনি বললেন ঃ জানেন তো আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি মনে করি লড়াইটা স্বাধীনতার, আওয়ামী

লীগের নেতৃত্ব মেনে লড়াই চালানো দরকার। তার ভিত্তিতে দুটি সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি। এক নম্বর হচ্ছে চলে যাবো। এখানে থাকলেই ধরে নিয়ে যাবে। য়ুনির্ভার্সিটির শিক্ষকদের মিলিটারি শাসকরা রেহাই দেবে না। ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। দু'নম্বর হচ্ছে য়ুনিভার্সিটি যতদিন সম্ভব চলতে দেয়া হবে না। একটি চিঠি ছাড়া দরকার সকল শিক্ষকদের নামে হুঁশিয়ারি দিয়ে। আর একটা লিফলেট ছাড়া দরকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে। একটা মেশিন পাওয়া গেছে। এবারে আপনার মতামত বলুন।

বললাম : সবার চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। কারো কারো থাকা দরকার। প্রতিরোধ আন্দোলন দেশের মধ্যে থেকে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য দরকার নানা স্তরে যোগাযোগ। তবে ঐ চিঠি ঐ লিফলেট ছাড়ার ব্যাপারে আমি একমত। কার কার সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে ?

তিনি বললেন : সিরাজ, সাদ (তখনো বাড়ি থেকে আসেননি), ভূগোলের মুনিরুজ্জামানের সাহায্য পাবো। এ বাদে আহসান, গিয়াস, শহীদুল্লাহ, রফিক আছে।

বললাম : এমনভাবে কাজ করেন যাতে গোপনীয়তা বজায় থাকে। সিরাজ, মুনিরুজ্জামানের সংগে বসা দরকার। ওদের সঙ্গে আপনি আলাপ করবেন। আমাকে খবর দেবেন। আর সামনের সপ্তাহে যাতে ঐ চিঠি ঐ লিফলেট বেরোয় তার ব্যবস্থা করবেন।

জয়নুল আবেদীনের চোখ ঝকঝক করছে। তীব্র একটা আক্রোশ তাঁর গলায়। বাইরে বেরিয়ে কেমন হাল্কা বোধ হচ্ছে। একটা সূত্র পাওয়া গেছে কাজ করবার ভাবনাকে রূপান্তরিত করবার, দেশকে নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার, প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলবার। একা নই, অনেকে আছে, গেরিলারা আছে, মানুষেরা আছে, আমাদের দায়িত্ব ঐ দুইয়ের মধ্যে সেতু তৈরী করা, স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে গেরিলা রণকৌশল বেধে দেয়া। লিলির ওখানে, মতিউর রহমান বসে আছে। ফর্সা চেহারা, মুখে মৃদু হাসি।

বললেন : কিছু করা দরকার। আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন ?

বললাম : আগে জানা দরকার আপনারা কি করছেন সেসব।

বললেন : আমি মোজাফফর ন্যাপের সংগে যুক্ত। আপাতত কাজ হচ্ছে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সীমান্তের ওপার ট্রেনিং এর জন্য পাঠিয়ে দেয়া। যে-সব গেরিলারা আসে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

বললাম : ঢাকা শহরে সংগঠন তৈরীর কাজ কতটুকু চলছে ?

বললেন : সংগঠন নেই, ভেঙ্গে গেছে, চেষ্টা চলছে গড়ে তোলার। গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ।

বললাম : সংগঠনটাই দরকার। সেই সঙ্গে দরকার একটা গোপন পত্রিকার। বের করা কি সম্ভব ? দৈনিক পত্রিকাগুলিতে রোজ মিথ্যে খবর বেরোয়। রেডিওতে

তাই। স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর পুরানো, বাসী, কতক অংশে অতিরঞ্জিত। এখানে যা ঘটছে তার ওপর খবর দরকার, বিশ্লেষণ দরকার। সেই সঙ্গে দরকার যারা ইচ্ছাকৃতভাবে খবরের কাগজে, রেডিওতে, টেলিভিশনে মিথ্যা খবর লিখছে, বলছে, সেইসব ব্যক্তির মুখোশ খুলে ধরা; সর্বস্তরের দালালদের মুখোশ খুলে ধরা।

বললেন ঃ পত্রিকার ব্যাপারে কথা আমি দিতে পারছি না। সামনের সপ্তাহে জেলা কমিটির একজন আসবেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো। আলাপ করবেন। তবে সবার সঙ্গে, চেনাশোনা যারা আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিন।

মতি চলে গেলেন। একবার ভাবলাম জয়নুল আবেদীনদের কথা বলি। পরে ভাবলাম দুইয়ের মধ্যে সূত্র হিসেবে আমি থাকে; সংগঠন দুদিক থেকেই তৈরী হয়ে যাক। কারণ প্রতিরোধের প্রথম শর্ত গোপনীয়তা। দ্বিতীয় শর্ত গোপনীয়তা। তৃতীয় শর্ত গোপনীয়তা। হঠাৎ মনে হলো একই দিনে দুটি আশ্চর্য যোগাযোগ আমার জীবনে ঘটলো। একেই কি বলে ইতিহাসের আকস্মিকতা ? নিয়তি ? আরো মনে হলো বহু দূরে কোথায় বুঝি ফুল ফুটছে, গন্ধ পাচ্ছি, ক্ষীণ, নিশ্বসিত, বাতাসে মেঘের মতন ভাসছে।

৯

মনের মধ্যে আস্তে আস্তে জেগে উঠছে ঢাকা ঃ ধুলো, ভিড়, কোলাহল, হঠাৎ নিরিবিলি রাস্তা, বৃষ্টি রোদ সবকিছু নিয়ে এক শহর, যেখানে আমি ছড়িয়ে আছি সেই কবে থেকে। সদরঘাটের সেই স্কুল বাড়িটা আছে এখনো ? কিংবা ঢাকা কলেজের পুরানো বাড়ির কাছেকার সেই চায়ের দোকান ? কিংবা য়ুনির্ভার্সিটির বাড়িগুলি ? মনের মধ্যে জ্বলে উঠছে অনেক মুহূর্ত, অনেক রাস্তা অনেক সন্ধ্যা দুপুর বিকেল; ঘুরে ঘুরে দেখছি; মনের মধ্যে জমছে অনেক লাশ, অনেক হত্যা, অনেক মৃত্যু; ঢাকা এভাবেই স্মৃতি আর জ্বালা, এভাবেই ঢাকা আমার কাছে এখন ধরা দিচ্ছে। এই ঢাকা, তার কোলাহল সকাল দুপুর বিকেল সবকিছুর ফাঁকে ফাঁকে, লাশ উপহার দিচ্ছে, বারে বারে ফিরে ফিরে একজন মানুষের লাশ উপস্থিত করছে, দখল করছে, বর্তমানটাকে দুঃখ আর যন্ত্রণার মধ্যে গলিয়ে দিচ্ছে; ঢাকা এখন নগ্নীকৃত, বিমর্দিত, বিপুষ্পিত আর আমি এখন উন্মূল, উচ্ছিন্ন, উৎপাটিত; সবই এক দমকে নষ্ট হতে যাচ্ছে; আমার স্বপ্ন, আমার গর্ব, আমার ঢাকা।

সকালে যখন আলোয় প্লাবিত হয় শহর, দুপুরে যখন এক বিশাল নীল উদ্ভাসিত করে আকাশে কিংবা বিকেলে যখন দিগন্ত বায়বীয় করে তোলে, তখন, সেই আলোয় তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় এক অনন্ত আশা ছড়িয়ে আছে। আশা, এই শহরে? যেখানে রাস্তায় লাশ বাড়িতে কান্না, অন্ধকারে মৃত্যু, সেখানেও কেন আশার চঞ্চলতা ?

আমি কি করে বেঁচে আছি এই শহরে ? এই হত্যা আর মৃত্যুর মধ্যে শান্তির বীজ, অগাধ রক্তের মধ্যে শৃঙ্খলা, ঢাকা কি তা-ই ? আমার প্রেম, আমার যৌবন, আমার প্রেরণা, ঢাকা কি তা-ই ? আমি আর ঢাকা পরস্পরের অংশ, দূরে, কাছে, ব্যক্ত, নীরব, এক অন্তর্লীন সুর, চিরকাল; সব হত্যার পরেও, সব রক্তের পরপারেও স্থির, অবিচল, চিরকাল।

কিন্তু আমি কি নীরব ? কিংবা স্থির, অবিচল ? মনের মধ্যে দুঃস্বপ্ন, আতঙ্ক আর তমিস্রা, ঐ সব নীরবতার বিপরীত; হৃদয়ে অজস্র উত্তেজনা আর অবিরল অন্তরীণ ক্ষয়, ঐ সব স্থিরতার অসমান্তর; আমাকে বেঁচে থাকতে হবে জীবনকে লুকোবার জন্য, মৃত্যুকে স্বাভাবিক করবার জন্য। ঢাকা শহর জ্বলে যাচ্ছে যাক; শহরের বাসিন্দারা মরে যাচ্ছে যাক; স্মৃতিতে ঐ সব রঞ্জিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে, আমি কি করে নীরব থাকতে পারি কিংবা স্থির, অবিচল ? আমাকে করে তুলছে ইতিহাস, আমার হৃদয়ে সজ্জিত হচ্ছে ঘটনা, মনে গেঁথে যাচ্ছে ভীষণ ও অদ্ভুত, আমার বেঁচে থাকার মধ্যে অনুদিত হচ্ছে প্রামাণিক ও সর্বজনীন বাংলাদেশ ; সেজন্য আমাকে হত্যা করার জন্য সচেষ্ট জল্লাদেরা। আমাকে ফিরে আসতে হবে নিজের কাছে, অবলুপ্ত দিনগুলিকে জ্যান্ত করে তুলতে হবে, বারে বারে ফিরে ফিরে যেন আমি বলতে পারি চিৎকারে চিৎকারে ঃ ঢাকা আমি তোমাকে ভুলিনি।

সেজন্য সর্বক্ষণ উত্তেজিত আমি, হৃদয়ে সর্বক্ষণ গর্জন ঃ শিকল সত্য নয়। আমি মানুষ; মমত্ববোধ আমার শক্তি, অস্ত্র ও প্রেরণা। চারপাশে সূক্ষ্ম কোলাহল, মগজে পৌঁছে দিচ্ছে বার্তা ঃ ঢাকা আমার চারপাশে। এখানেই আমি বেড়ে উঠেছি, পৌঁছেছি পনেরো ঊনিশ একুশ পঁচিশ তিরিশ বয়েসগুলিতে। আমার সব মৌলিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আমার মনের মাটি এখানেই তৈরী হয়েছে। জ্যান্ত এই শহর হাত বাড়িয়ে আমাকে একদিন তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে, আমি ছড়িয়ে গিয়েছি অন্তহীন; আর আজ আমি এই শহরে লুকিয়ে, আজ আমি শহরের কেউ নই। কোথাও আজ মানুষের কণ্ঠস্বর নেই, এক নিথর স্তব্ধতা, ঘিরে ধরেছে শহরকে। অথচ, এটা ঢাকা, ঢাকার আজ পতন ঘটছে, আজ কোথাও আলো নেই। অন্ধকারের মধ্যে দমবন্ধ হয়ে আসে; তবু অন্ধকার ফেটে আলো আসে। আমার সেই আলোর স্বপ্ন, সেই এক অপেক্ষমান ঢাকা শহরটার স্বপ্ন মনের মধ্যে নিত্য আর চিরন্তন; আমি সেই স্বপ্ন দেখছি, তাকে শুনছি; অন্য সব দৃশ্যে আমি অন্ধ, অন্য সব শব্দে আমি বধির।

কবরের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে ঢাকা, টিক্কা খানের ক্লেদাক্ত মুখে ঢাকার নাম। যেন চাবুক, তবু যন্ত্রণা শান্ত ও অনুদ্বেল, কারণ হয় তো আমি নিঃসাড় নই, আমি এখনো মরে যাইনি। সরে যাচ্ছে লাশের ওপরকার ঢাকনা, কবরের মুখ খুলে যাচ্ছে ঃ ঢাকা, বেরিয়ে এসো ; বাসিন্দারা, বেঁচে ওঠো। যেনো মন্ত্র, অমোঘ; কিংবা আশ্বাস, প্রবল; কিংবা বিশ্বাস, শান্তির। যা প্রথমে ছিল একটা আতঙ্ক, তা আস্তে আস্তে অনুদিত হয়ে যাচ্ছে চেতনায়, আমার কয়েকটা মৌলিক বোধ এক পরীক্ষার সম্মুখীন। জানি

সবাই মৃত্যুর অধীন; কোন দেশের নাম, কোন জাতির সত্তা যখন হত্যার অধীন, বন্দুকের ক্রীড়নক, যখন সত্য বন্দুকের নলের মুখোমুখি, তখন ঢাকা শহরের জন্য অমন মমতায় আমি আচ্ছন্ন কেন ? জবাবের জন্য খুব ব্যাকুল নই, হত্যায়ও খুব কাবু নই এখন, শুধু মনে হচ্ছে একটা জরুরি কাজ ফেলে রেখেছি, বাকি পড়ে আছে। ঢাকাকে বেঁচে থাকতে হবে ঃ একটি বাক্য, একটি বোধ; গোটা শহরটা আমার মগজের মধ্যে; অনেক বাক্য, অনেক বোধ, নিজে নিজেই তৈরী হয়ে অস্থির কিংবা পাগল করে তুলেছে আমাকে। এখনো বাকি আছে; এই বিশৃঙ্খল, পতনময় শহরের মধ্যে এক কণা নিশ্চয়তা লুকিয়ে আছে আমার জন্য, আর আমি তা খুঁজে পেয়েছি।

আজ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় প্রথম বোমা ফুটেছে। ঐ শব্দ ফের ঢাকা শহরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে, মনে হচ্ছে মর্যাদাবোধ ফের ফিরে পেয়েছি।

রাত্রিবেলা কথাগুলি লিখছি; মনটা শান্ত হয়ে উঠেছে।

১০

কাকড়াইলের মোড়; ফজল শাহাবুদ্দীন রিকশায় যাচ্ছেন, দেখেই গাড়ি থামালাম। বেলা এগারোটা, রোদের ছড়াছড়ি, গাছেরা আকাশে উঁচু হয়ে আছে। ফজল শুকিয়ে গেছেন, রং তামাটে।

জিজ্ঞেস করলাম ঃ কবে এসেছেন ?

একটু হেসে জবাব দিলেন ফজল ঃ চার দিন হল।

শামসুর রাহমানের খবর কি ?

ফিরেছেন।

কোথায় ছিলেন এতদিন ?

গ্রামে।

দেখা হবে ?

হ্যাঁ।

কোথায় ?

আপনার অফিসে, দুটো নাগাদ।

ফজল রিকশায়, আমি গাড়িতে, দুজন দুদিকে। আমার গন্তব্য জয়নুল আবেদীনের ওখানে। গতকাল বিকেলের কাজের খতিয়ান জানা দরকার। ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রচারপত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উদ্দেশে সতর্কলিপি এবং ছাত্রদের উদ্দেশে প্রচারপত্রের ফলাফল জানা জরুরি। সবই দেয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ সরকার কোথায়, কে জানে! আমরাই এখানে ঐ সরকার, বাংলাদেশের বিবেক। ছাত্রদের নাকি সচেতন অংশদের জানানো কর্তব্য সব এখনো শেষ হয়ে যায়নি, শুরু হয়েছে মাত্র, হতাশা নয়, বরং আশাই একমাত্র অস্ত্র বেঁচে

থাকবার। জয়ের অন্য নাম আশা; সেজন্যই বিরোধীপক্ষের একমাত্র কাজ মানুষকে হতাশ করে তোলা। কিন্তু সবাই, প্রতিটি ব্যক্তি এখন খুঁজে ফেরে এক কণা আশা, গুজবের টুকরো, বানানো প্রতিরোধ, ঐ সব খেয়ে আকালে বেঁচে থাকে। গতরাতে কলোনিতে ফিসফিস শুনেছি ঃ ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের কারো কারো হাতে প্রচারপত্র এসেছে। সকালে অফিসে এসে শুনেছি ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পোস্টার পড়েছে। একমুখ থেকে অন্য মুখে কথা ছড়িয়ে যায় আগুনের মতন, এ আগুনে নিজেদের পরিশুদ্ধ করছি সাগ্রহে, সতৃষ্ণভাবে অবিরল। ঐ আগুন যেন দ্বারপথ, আমরা পেরিয়ে যাচ্ছি অনবরত নরক থেকে দূরে। কিন্তু আমরা কারা ? কিংবা কজন ? সারাদেশ, নাকি গুটিকয় বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তি, নিসর্গের আলোয় উদ্ভাসিত। ঐ নিসর্গ মানুষ, তরুসকল, নদীর হৃদয়; আমার। আমাদের প্রাণপণ প্রয়াস ঐ মুখ, তরু, নদীর কাছে যাবার। হয়তো এভাবেই আমি থেকে আমরায় আসা যায়। আর এখনতো তাই দরকার, জরুরি।

জয়নুল আবেদীনের ওখানে সিরাজ (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) আর জামান (মুনিরুজ্জামান) বসে। প্রচারপত্রে কাজ হয়েছে। দালাল শিক্ষকরা ভয় পেয়েছে, হতমান শিক্ষকরা গা ঝাড়া দিয়েছে, ছেলেরা খুশী আর চঞ্চল। অন্যপক্ষে জল্লাদদের সতর্কতা বেড়েছে। হয়তো এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুদিন অচল করে রাখা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় অচল থাকার গুরুত্ব অনেক। বাইরের পৃথিবীতে জানাজানি হবে সব কিছু স্বাভাবিক নয়। দেশের মধ্যে জানাজানি হবে প্রতিরোধের শক্তি বেড়েছে। ঠিক হলো আমাদের সবার আরো সতর্ক হওয়া দরকার; দেখাশোনা আরো কমানো দরকার; পরস্পরের যোগাযোগের জন্য বার্তাবাহক তৈরী দরকার। আরো ঠিক হলো সপ্তাহ খানেক বাদে শিক্ষকদের উদ্দেশে আর একটি চিঠি পাঠানো দরকার। জয়নুল আবেদীন জানালেন ভারতে চলে যাবার ব্যাপারে তিনি মতস্থির করে ফেলেছেন। সিরাজ জানালেন তিনিও যাবেন, তবে এখন নয়, পরে। মুনিরুজ্জামানেরও তাই মত।

রোদ গানের মতন; চোখে রাস্তা; গাড়ি দ্রুত মতিঝিলের দিকে। মন হাল্কা লাগছে; সে কি বন্ধুদের ফিরে পাওয়ার জন্য ? কাজের অগ্রগতির জন্য ? বাতাস থেকে থেকে; গাছের পাতায় পাখিদের চলাচল আর আকাশে; বাড়িগুলি রাস্তার পাড়ে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে; দু-একটা রিকশা যাচ্ছে কিনারা ঘেঁষে; আমেরিকান সেন্টারের সামনে সৈন্য দাঁড়িয়ে; তোপখানার সরকারি ভবনের গেটে কোন ভিড় নেই; সবকিছু ছিমছাম; এমন কি ভিখারীও নেই এই অভাবী শহরে। ম্যান্ডারীন রেঁস্তোরা থেকে একটি জীপ রাস্তায় উঠে এসেছে, একজন পাঞ্জাবী সামরিক অফিসারের পাশে একজন বাঙালিনী বসে; কথা বলছে। যুদ্ধ এদের বিরুদ্ধেও; স্পষ্ট, ঋজু, দ্বিধাহীন; যুদ্ধ আমার জন্য আত্মবিকাশ, অনুসন্ধান; জীবন এখন দীর্ঘশ্বাসের বৃত্তে আবদ্ধ; সেজন্য যুদ্ধ মনুষ্যত্বের জন্য জরুরি; আমার জন্য নিঃসংশয়; আমার মধ্যে উপস্থিত গানের মত রোদ, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন অমর; রোদের মতন মানুষ, কর্মিষ্ঠ দুর্জয় নয়নাভিরাম; মানুষের নিসর্গ আর শরীরের তরু; আর সন্ধান, অন্বেষণ প্রতিদিন স্বাধীনতার স্বদেশের মর্যাদার ভবিষ্যতের।

শামসুর রাহমান আর ফজল শাহবুদ্দীন অফিসের দরজা দিয়ে যেনো ভেসে এলেন। শামসুর রাহমানের চুল প্রায় শাদা, চোখে ক্লান্তি, যেনো অনেকদিন ঘুম নেই চোখে। বিষয়তো একটাই আলাপের ঃ কি করা যায় এখন ? পত্রিকা বের করার কথা আমি তুললাম। শামসুর রাহমান বললেন ঃ পত্রিকা দরকার, তবে এখনো সময় আসেনি। ফজল বললেন ঃ চলে যেতেই হবে আমাদের, এখানে থাকার কোন মানে নেই এখন। জিগগেস করলাম হাসানের কথা। হাসান এখানেই আছে। দেখা সম্ভব ? নিশ্চয়ই। তারপর আলাপ হলো গ্রাম নিয়ে। ফজল জানালেন ঃ নবীনগরে মিলিটারি গেছে। বাজারে বাজারে পাকিস্তানের নিশান, কিন্তু লোক নেই। শামসুর রাহমান জানালেন ঃ রায়পুরায় লোকজন ভয়ে লুকিয়ে থাকে দিনমানে। রাত্রিবেলা বেরোয়, পরস্পরের খোঁজখবর নেয়। ফজল আরো জানালেন ঃ সীমান্তের রাস্তায়, রাস্তায় কড়া পাহারা বসিয়েছে পাকিস্তানীরা। তবু সীমান্ত পেরনো সম্ভব। শামসুর রাহমান ফের বললেন ঃ যদি যেতেই হয় সবাই একসঙ্গে যাবো।

ওঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই অফিসের বন্ধুরা বললেন ঃ ওঁরা এখনো কেন আছেন ? আপনিও বা কেন ? আপনাদের সবাইকে পাকিস্তানীরা মেরে ফেলবে।

বাসামুখী ঐ সব ভাবছি। বহু বছর আগে দেশ জড়িয়ে ধরেছিল। এখন ঝড়; এখন, আমরাই নিশানা। সেজন্যই এখন হ্যাঁ দেশের প্রতি, স্বাধীনতার প্রতি, নিজের প্রতি। মনে হচ্ছে যথোচিত কাজ করিনি, কখনো করিনি, তাই প্রবল একটা ভার আর অনিশ্চয়তা চেপে ধরেছে। নিজেকে পরিচিত করতে হবে মৃত্যু আর সংলগ্ন নির্যাতনের সঙ্গে। ঐ ভাবে পৌঁছোতে হবে জীবনের কেন্দ্রে।

রেসকোর্সের পাশে একটা পাগল বিড়বিড় করছে। বোঝা যাচ্ছে গাল দিচ্ছে সৈন্যদের, হাত ছুঁড়ছে আকাশে। সেকি আল্লাহর কাছে নিবেদন ? কিংবা নিশান প্রতিবাদের ? কে জানে। মিলিটারির একটা গাড়ি বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসছে। পাগলটা এগিয়ে এসে কি সব বলল মুখভঙ্গি করে। আর সঙ্গেই একটা গুলী এসে বিঁধলো, পাগলটা লাশ হয়ে গেলো, রেসকোর্সের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলো। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে; চোখে জাগলো আর এক পাগলের নৃত্য আর আর্তি ঃ রাজা লিয়ার; ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে।

বাসায় এসে শুনলাম কলোনির আর একটা ছেলেকে দুপুর বেলা ধরে নিয়ে গেছে।

১১

সারা রাত ঘুমুতে পারিনি। পাশের ঘরে রাজিয়া আপা কেঁদে চলেছেন। দুই ছেলে সিলেটে, কোন খবর নেই। সারাদিন খাননি, রাতেও না। ছেলে সিলেটে, কি হচ্ছে কিছু বোঝার উপায় নেই। শুধু গুজব, ঐ ফাঁদে ধরা দিচ্ছে সবাই। এক মা কাঁদছেন তাঁর ছেলের জন্য, কান্নার মধ্যে মিশে যাচ্ছে ক্রোধ আর ভয়। আমার মনের মধ্যে কান্না

জমছে ঃ কুমিল্লার বোনের জন্য, নোয়াখালীর ভাইয়ের জন্য, চট্টগ্রামের ভাই আর বোনের জন্য, আর করাচীর বোনের জন্য; জানি না কে কেমন আছেন, তাই অনবরত ভ্রাম্যমান আমি, মনে মনে, নিশ্চিত দূরে, বিপন্ন সন্তান আমরা সবাই, এক গোপন সন্ধানে সবাই আমরা ব্যস্ত, লক্ষ্য সেই তাকে ঃ স্বাধীনতাকে, যার ব্যবধান জাগিয়ে তুলছে আমাদের মধ্যে দুরাকাঙ্খা। ঐ লক্ষ্য নাকি গন্তব্য এখন আমাদের মৌলিক বিধান, মৃত্যু আর জীবনের মধ্যবর্তী বিকীর্ণ জ্যোতির বিন্দু; কান্নার মধ্যে দিয়ে একজন মা কি যাচ্ছেন ঐ দিকে ? অনবরত খোঁজার মধ্যে দিয়ে আমিও কি যাচ্ছি ঐ দিকে ? তাই, এসো এখন সময়; এসো যখন ইচ্ছে; এসো স্বপ্নে; এসো মনে, কান্নায় কিংবা গুঞ্জরণে; ফিরে এসো ঃ স্বাধীনতা; জেনো আমি কিছুই রাখিনি হাতে, যা তোমার নয়।

সকাল বেলা, জানালার ওপাশে বাশুর মুখ, হাসানের ড্রাইভার। কি ব্যাপার ? সাহেব যেতে বলেছেন। কাঁঠাল বাগানে এক গলির মধ্যে এক তলা এক বাড়ি, বাশু বলল ঃ এখানেই। দরজায় টোকা দিতেই হাসান বেরিয়ে এলেন, দাড়ি ভর্তি মুখ। ম্লান, বিষন্ন, চিন্তাক্লিষ্ট।

জিগগেস করলাম, এখানে কবে থেকে ?

পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন হাসান, চা খাবেন ?

সায় জানালাম ; দিশা, হাসানের ছেলে চা বানাতে গেলো। সাংঘাতিক কষ্ট হলো, সে কি দিশা চা বানাতে গেলো বলে ? কিংবা হাসানের চেহারা দেখে ? কিংবা সবকিছুর জন্য ?

হাসান ফের বললেন, মোহাম্মদপুর থেকে বহু কষ্টে পালাতে পেরেছি। গাড়িটা বিক্রী করে দিয়েছি। ঐ এখন সম্বল। ঠিক করেছি কাগজে জয়েন করবো না। চেহারা পাল্টাবার জন্য দাড়ি রেখেছি। মশিহুর রহমান, যশোরের, জানেন তো আমার আত্মীয়, মিলিটারির হাতে মারা গেছেন। স্ত্রী তো ভেঙ্গে পড়েছেন। তবু জয়েন করবো না। মনের কাছে অপরাধী ঠেকে। ভাবছি ওপারে চলে যাবো। ব্যবস্থা করা কি সম্ভব ?

বাশু অন্য জায়গায় চাকরী করে, খোঁজ রাখে আমাদের। বাশুই আপনাকে দেখেছিল, সেজন্য বলেছিলাম ডেকে নিয়ে আসার জন্য।

হাসান আরো বললেন, যুদ্ধ বেশী দিন হয়তো চলবে না। বড়ো জোর মাস দুই। পাকিস্তানের পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। তবে ততদিন বেঁচে থাকতে পারব কিনা সন্দেহ। গাড়ির টাকায় বেশীদিন চলবে না। তারপর ? সেজন্যেই ওপারে চলে যেতে চাই। কিছু তো করতে পারব। লিখে রোজগার করে, লিখে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে। কিন্তু এখানে তো কিছু করতে পারছি না। শুধু লুকিয়ে থাকা ছাড়া। কিন্তু সেও বা কতদিন ?

হাসানের বাড়ি পেছনে, সামনে গ্রীন রোড, তারপর কলোনি। রোদ সবে উঠেছে। চারপাশের বাড়িগুলি আবিষ্ট ভোরে। রোদ আলোর পুঞ্জ হতে এখনো বাকি এখনো রোদে প্রবিষ্ট শিশির, ঠাণ্ডা; এখনো রোদ নীল, শান্ত, নির্জন; তারপর টুকরো টুকরো কাজের জোড়া দিয়ে দিনের শুরু হবে; রোদ পোড়বে, বিধ্বস্ত করবে সব সঙ্কল্প, ইচ্ছা

আর উৎসাহ। কেউ কোথাও নেই শূন্য রাস্তা, সবাই অন্তরালে, বাড়ির নিরাপদে। শুধু দূরে, গলি যেখানে বড়ো রাস্তায় মিলেছে, সেই মোড়ের বাড়িটার দেয়ালে একটা ছেলে কি সব লিখছে দ্রুত। আমাকে দেখেই দৌড়ে চলে গেলো, হয়তো উজ্জ্বল অন্ধকারে। বয়স বড়োজোর চৌদ্দ-পনেরো, রোদের মধ্যে নিশানের মতন। দেয়ালে লেখা ঃ জয় বাংলা মিলিটারি, তারপর নেই, কি লিখতে চেয়েছিল জানি না; শুধু লেখাটা চঞ্চল, উৎসুক, সঞ্চরণশীল। হঠাৎ দেখি পাশে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ, লেখাটা পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এমন হাসি বহুদিন আমি দেখিনি।

বাসায় ফেরার পর গৃহকর্তা জানালেন ঃ চাল, চিনি, মাছ বাজার থেকে উধাও। গ্রাম থেকে চাল আসা বন্ধ। নদীতে মিলিটারিরা কারফিউ দিয়ে রাখে, সেজন্য জেলেরা মাছ ধরতে পারছে না। আর চিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার অরাজকতার জন্য আনা সম্ভব নয়। শুনে গেলাম চুপ করে। অমন হবে জানা কথাই। সব শান্ত নয়, স্বাভাবিক নয়। ঐ কথা কটি তারই সমর্থন। গ্রামে বুড়োরা; আর ঘাস, ধুলো, কাক; আর ছেলেরা ? মারা গেছে। গাছ খা খা; মেয়েরা বিধবা বিছানায়। আর ছেলেরা ? যুদ্ধ করছে। কবেকার পড়া কবিতাটা উন্মীলিত হলো মনের মধ্যে নদীর মতন বাংলাদেশটা উদ্ভাসিত হলো চোখের মধ্যে, আর আমি দপদপ করা কপালটা ঢেউয়ের মধ্যে চেপে ধরেছি, অন্ধের মতন ফের ফিরে চলেছি মানুষের কাছে।

অফিসে সিদ্দিকী সাহেব, আমার সহকর্মী জানালেন ঃ সাজ্জাদ কাদির দেখা করতে আসবে। সিদ্দিকী কিছুদিন আগে ফিরেছেন গ্রাম থেকে। মার্চে ঢাকা ছেড়েছেন, পায়ে হেঁটে বাসে চেপে কোনমতন পৌঁছেছেন টাঙ্গাইলে, নিজের বাড়িতে, সেখান থেকে ফের উত্তরবঙ্গে, শ্বশুর বাড়িতে। বগুড়ায় মারা যাচ্ছিলেন প্রায়, পাকিস্তানী বিমানের মেশিনগানিংএ। সিদ্দিকীকে বললাম, সাজ্জাদ এলে বসিয়ে রাখতে। আমার একটু কাজ আছে, বাইরে যাচ্ছি।

বেলা সাড়ে দশটা, কমফোর্ট রেঁস্তোরা। ডলি বসে আছে। মুখ শুকনো। সপ্তাহখানেক হল পাবনা থেকে এসেছে। দুজন খানিকক্ষণ বসে থাকলাম চুপচাপ। জিগগেস করলাম কেমন আছো, বলো ?

একটু হেসে বলল ডলি, ভালো। গ্রামে থাকা নিরাপদ নয়, তাই শহরে এসেছি। নেহাৎ কলেজের চাকরি রক্ষা করার জন্য নয়। এত হেঁটেছি জানো ? এক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে, দূরের গ্রামে, সৈন্যরা যাতে পৌঁছুতে না পারে। আগে গ্রামটা ছিল পুকুর, বাড়ির ছাদ, আরাম আয়েস; এখন আর নয়। এখানে এসেও ভয়ের হাত থেকে রেহাই নেই। রাতে ঘুম আসে না, ভয় হয়। বাসায় তোমাকে ডাকতে পারতাম। কিন্তু তোমার পেছনে কেউ থাকা বিচিত্র নয়। তাই এখানে ডেকেছি।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছি আর ভাবছি। ভাবনার অন্তরালের হাড়গোড়, মজ্জা, স্মৃতি ও স্বপ্ন, আর্তি ও আনন্দ, ভ্রান্তি ও ব্যর্থতা স্পষ্ট দেখছি; নিরাপদ নামক শব্দটার কারুকাজ খসে খসে পড়ছে, উঁকি দিচ্ছে বিভিন্ন পশ্চাৎপট। অসহায় সেই সঙ্গে যোদ্ধা,

ব্যক্তির শত রূপান্তর আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে আমি থেকে আমরায়; আমরা মানুষ মেঘ রৌদ্রে বাঁধা সুখ দুঃখ, আমরা মানুষ রক্ত গোলাপের প্রবলতা ঃ ডলি তুমি কি তা নও ?

ডলি ফের বললো, পাবনায় যুদ্ধ চলছে দুধরনের। পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সেই সঙ্গে জোতদারদের বিরুদ্ধে। জোতদাররাই শান্তি কমিটির মেম্বার, জামাতের মুসলিম লীগের লোক, তারাই দালাল সৈন্যদের; সেজন্য তারাও মরছে, সৈন্যরাও মরছে। স্বাধীনতার যুদ্ধ সেই সঙ্গে গৃহযুদ্ধ, তাই নয় ? যমুনা পার হতে পারত না সৈন্যরা। সারা রাত বৃষ্টি, নদীর পাড়ের ট্রেঞ্চগুলো পানি ভর্তি, মুক্তিযোদ্ধারা সরে গেল। সেই সুযোগে নদী পার হল পাকিস্তানীরা; আসলে যুদ্ধ তো আমরা কখনো দেখিনি, করিনি। মুক্তিযোদ্ধা এক ছেলের কথা শুনেছি। গাছের আড়াল থেকে ট্যাংক প্রতিহত করার চেস্টা করেছে। কিন্তু সে তো সম্ভব নয়। যারা নেতা তারা সব উধাও। লড়াই করছে স্থানীয় লোক, সাধারণ মানুষ, মানসম্মানের জন্য, জমি চাষ করবার জন্য, ভিটেমাটি রাখার জন্য। গ্রামে আগে কখনো ঘুরিনি, এবারে অনেক গ্রামে ঘুরেছি, নেহাৎ বেঁচে থাকার জন্য। আমি তো মেয়ে মানুষ, রাজনীতি করি না, কিন্তু এবার বুঝেছি যুদ্ধটা সবাইকে দিশেহারা করে দিয়েছে, আবার একও করেছে। কিন্তু একটা কথার জবাব দাও ঃ বেঁচে থাকতে পারব তো ?

প্রশ্নটা আমাকে বোবা করে দিয়েছে। জবাব জানি না। স্বাধীন গ্রাম আর স্বাধীন শহর নিয়ে বাংলাদেশের যে-স্বাধীনতা সে কতদূর ? সে কখন ?

ডলি উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। নিজের হাতে ডলির হাত টেনে বললাম ঃ বিশ্বাস হয় না তোমার ?

চমকে দেখি সাজ্জাদ কাদির আর নুরুল হুদা। সাজ্জাদের চুল নেড়া, হাড় বের করা চেহারা। পাশের টেবিলে সিদ্দিকী, অফিস প্রায় খালি। কয়েক পলক চুপ করে তাকিয়ে আছি।

পরে জিগগেস করেছি, খবর কি ?

সাজ্জাদ ম্লান হেসে বলল, ভালো নয়। এখানে তবু কিছুটা স্বস্তি আছে। টাঙ্গাইলে তাও নেই।

ফের জিগগেস করলাম, কেমন লিখছেন ?

হাসল সাজ্জাদ, বুঝতে পারি না কি লিখব। লেখার জন্যই তো বিপদে পড়েছি। লিখি বলেই তো ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

বললাম, লেখাটা দরকার, হয়তো বাঁচার জন্যই।

নুরুল হুদা বলল, আমারও তাই মনে হয়।

জিগগেস করলাম, কক্সবাজারের অবস্থা কি ?

নুরুল হুদা বলল, হাজার পাঁচেক লোক আরাকান হয়ে বার্মায় আশ্রয় নিয়েছে। পাহাড়ে মুক্তিবাহিনীরা সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে।

সাজ্জাদ মৌন ভেঙ্গে বলল, আজ আমরা উঠি। ফের আসব।

সাজ্জাদরা চলে যাবার পর সিদ্দিকী বলল, ওর ওপর খুব অত্যাচার হয়েছে। ঐ শরীর, পিন ফুটিয়েছে, মেরেছে বেদম। অমন করেছে কে জানেন ? ওরই সম্পর্কে ভাই, জামাতের সদস্য, রাজাকারদের কমান্ডার। টাঙ্গাইলে বোমা ফুটেছিল। সেজন্য ধরে এনেছিল শহরের সব যুবকদের, সাজ্জাদের বাবাও রেহাই পাননি। সাজ্জাদের অপরাধ ঃ সে কবিতা লেখে, রবীন্দ্রনাথ পড়ে, ঐ সব। কয়েদ করে ওকে পড়তে দিয়েছে জামাতের বই-পত্র, মওদুদীর চিন্তা, মাথা যাতে সাপ হয়।

হঠাৎ সিদ্দিকী বললেন, আচ্ছা একটা কথা জিগগেস করব।

বললাম, কি ?

সিদ্দিকী কয়েক লহমা চুপ থেকে ফের বললেন, কেন থেকে গেছেন ?

বললাম, এমনিতেই।

সত্যি কেন থেকে গিয়েছি ? কেন পালাইনি ? জানি না কিংবা জানি; চোখ অন্ধ, মনের মধ্যে দেশ, চোখ খোলা, শুনছি কান্না; সম্ভব কি প্রতিরোধ গড়ে তোলা একসূত্রে বেঁধে সবাইকে ?

টেলিফোন এসেছে। লিলি ঃ বিকেলে আসবেন। বললাম ঃ আসব। অফিসপাড়া চুপ, অল্প বাতাস বাইরে, গ্রামের দুপুরের মতন রোদ আকশে মেলা, মেঘে রোদ, নীলে রোদ, উধাও দূরদূরান্তে। সেইসব থেকে যেন ধ্বনিত হচ্ছে ঃ আসব। ফের আমরা আসব।

লিলির ওখানে মতির সঙ্গে একজন ভদ্রলোক বসে। পরিচয় হল ঃ কবির (কুতুবুর রহমান)। বেঁটে, মোটামতন, চোখে কালো চশমা।

জিজ্ঞেস করলাম, খবর বলুন। খবরের জন্য উপোস করে আছি।

কবির , ওপারের খবর সুবিধাজনক নয়। দলাদলি চলছে। কাজের চেয়ে বক্তৃতা বেশী হচ্ছে। তবু ছেলেরা যাচ্ছে, আমরা নিয়ে যাচ্ছে। পার্টি বুঝতে পেরেছে দেশের ভেতরে কাজ করতে হবে। দু'একজন এসেছেনও ভেতরে। দরকার এখন যোগাযোগ, সব স্তরে, পর্যায়ে।

আমি বললাম, কাগজের ব্যাপারে কি করেছেন ?

কবির বললেন, জেলা কমিটি জানিয়েছেন ওপার থেকে কোন সাহায্য সম্ভব নয়। এখানকার সম্বলেই বার করতে হবে।

ফের বললাম, মেশিন আছে ?

কবির বললেন, ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা তিনজন কেন্দ্রে থাকব। বার করা, বিতরণ করা, সব দায়িত্ব আমাদের। তবে কাগজটার বক্তব্য কাদের জন্য থাকবে ?

বললাম, সবার জন্য, কর্মী, সহানুভূতিশীল ব্যক্তি, স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দল সবার জন্য। স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের ডাক একসঙ্গে দিতে হবে। যেখানে আমাদের ভিত্তি আছে, যেখানে গেরিলারা কাজ করতে আসে সব জায়গায়ই কাগজ ছড়াতে হবে। বক্তব্য বুনে দিত হবে সবার মনে।

কবির বললেন, একমত আমি। মতি, আপনি ?

মতি বললেন, আমিও।

জিগগেস করলাম, কাগজের কি নাম হবে ?

কবির বললেন, আপনি বলুন।

এক লহমা চুপ থেকে বললাম ঃ স্বাধীনতা।

কবিরের আর মতির চোখ জ্বলে উঠেছে ঃ স্বাধীনতা। শব্দ ঃ জীবনের স্বপ্নের অধীশ্বর; বুকের মধ্যে বৃক্ষের মতন স্বাভাবিক উৎসাহে বেড়ে চলে; চোখে ফুটিয়ে তোলে স্বপ্নের মেঘ; ইচ্ছে করে দুহাত ধরে আদর করতে ঃ শব্দে গড়ে উঠুক স্বাধীনতা।

কবির ফের বললেন, কাগজটা পাক্ষিক হবে। দুদিনের মধ্যে লেখা তৈরি করে দেবেন।

আমি বললাম, একটা কথা আছে। আমার এক বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান চলে যেতে চাচ্ছেন। ব্যবস্থা করা কি সম্ভব হবে ?

কবির বললেন, সম্ভব হবে। পরে জানাব। একটা কথা, আজ রাতে বাসায় থাকবেন না। দুপুরে আর বিকেলে ধর-পাকড় হয়েছে। সামনের সপ্তাহে ফের আমরা বসব। মতি যোগাযোগ করবে। চলি আজ।

কবির আর মতি চলে গেলেন। লিলি এসে জিজ্ঞেস করল কিছু, চাল যোগাড় করে দেয়া যাবে কি না।

আনমনে বললাম, হ্যাঁ। সত্যিই তো স্বাধীনতা খাওয়া পরার সমস্যা। চিরকালই তাই।

বাসায় এসে গাড়ি রেখে ফের বেরিয়েছি। পকেটে কিছু টাকা আর আইডেনটিটি কার্ড; কাগজে জড়ানো পাজামা আর টুথব্রাশ। আজুর বাসার দিকে যাচ্ছি রিকশা চেপে, দুপাশে অন্ধকার। রাত নটা থেকে কারফিউ।

১২

হাশিম সাহেব বলেছেন, মেয়ের জন্য একটা বর খুঁজে দেবেন। চারপাশে যা ঘটছে ভয় হচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

মুনিরুজ্জামান বলেছেন, যাত্রাবাড়ির কাছে এক ভদ্রলোককে মেরে ফেলেছে। তাঁর স্ত্রী ছেলের হাত ধরে হাজির। সাহায্য করা কি সম্ভব ?

গিয়াস বলেছেন, নাজমুল হক, চট্টগ্রামের এন্টিকরাপশনের ডেপুটি ডিরেক্টর, ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সোবহানবাগ সরকারি কোয়ার্টারে চাচার বাসায় আশ্রয় নিয়েছেন। সাহায্য করা কি সম্ভব ?

সিরাজ বলেছেন, শামছুজ্জামান, চট্টগ্রামের টেলিগ্রাফসের এস. ডি. ও, ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা, দুই ছেলে নিয়ে আট নম্বর বকশী বাজারে উঠেছেন।

বড়ো ছেলের বয়স প্রায় দশ। সাহায্য করা কি সম্ভব? সিদ্দিকী বলেছেন, জয়দেবপুরের কাছেকার ছাদনা স্কুলের সহশিক্ষক আইনুল হকের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। পরিবার শুদ্ধ উপোস করছেন ভদ্রলোক। সাহায্য করা কি সম্ভব?

কবির (কুতুব) একটি তালিকা পাঠিয়েছেন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তির বাসিন্দাদের হিসেব। আর পাঠিয়েছেন রূপগঞ্জ থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের লোকসংখ্যার হিসেব। কাটাবনে ছিল ১৮৭৭৬ জন; হাতীরপুল ২৪০০ জন; কাঠালবাগানে ৩৫০০ জন; বাবুপুরায় ৩৭৮০ জন; কাওরান বাজারে ১৩৫০০ জন; ইকবাল হলের পাশে ৭৯০০ জন; নিমতলীতে ১৩০০ জন; ফুলবাড়িয়ায় ২৫০০ জন; গবর্নমেন্ট হউসের পাশে ৭৬০০ জন; নারিন্দায় ৮২০০ জন; ধোলাইখালে ৪২০০ জন; গেন্ডারিয়ায় ১৪৫০০ জন; বস্তিগুলি মিলিটারি পুড়িয়ে দিয়েছে। রূপগঞ্জ থানার খতিয়ান দেখছি।

ইউনিয়ন	গ্রাম	পঁচিশে মার্চ পূর্ব জনসংখ্যা	বর্তমান	মৃতের সংখ্যা
গোলকান্দাইল	হোড়গাঁও	১৯৫০	১১৫০	১০
	সাওখাট	২১০০	১০০০	২০
	গোলকান্দাইল	২৬০০	১৫০০	২২
	আমলা	৪০০	৩০০	×
	পোড়াব	২৫০	১০০	৫৩
	বলাইসারটেক	৭৫০	৫০	৪
	মাহনা	১৮০০	৮০০	৬
	কালি	৮০০	৩০০	৪
	দাড়িকান্দি	১৭০০	৭০০	৮
ভুলুতা	ভুলুতা	৮০০	১৫০	১৫
	মর্তুজাবাদ	১৫০০	৫০০	৭
	হাটাব	২২০০	৮০০	১৫
মুড়াপাড়া	মুড়াপাড়া	২০০০	৫০০	২০
	দাড়িকান্দি	১৪০০	৪০০	২৫
	ব্রাহ্মনগাঁও	১১০০	২৫০	৩০
	বাসিয়াদী	১২০০	২০০	৩০
	মাহিমপুর	২৩০০	১৩০০	২৫

মানুষজন গেছে কোথায়, বাংলাদেশের কোন গ্রাম থেকে কোন গ্রামে শোক কিংবা শ্লোকের মতন ভেসে গেছে। শোক ঃ শব্দবিহীন; শ্লোক ঃ শব্দ সর্বস্ব; মানুষেরা ঐ দুই নিয়ে কেবল যাচ্ছে উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে ঈশান থেকে নৈঋত ঘুরে চক্রাকারে বাংলাদেশে। সেই সব ভাবছি আর দেখছি বৃষ্টি, আর ভাবছি হাশিম সাহেব মুনিরুজ্জামান গিয়াস সিরাজ সিদ্দিকীর কথা। একটা ঘটনার মধ্যে গাঁথা সবাই, বস্তির

মানুষ আর ভদ্রলোকেরা, শহর আর গ্রাম, সবই হয়তো অবসন্ন, হয়তো সবার হৃদপিণ্ড শব্দ করতে ভয় পায়। আর বাইরে বৃষ্টি, তুমুল প্রচণ্ড একটানা; চোখ ঘুড়ির মতন আকাশে, আর আকাশে হাওয়ার তীব্রতা, শহরে জমছে গ্রামের কাঁদা গ্রামের অন্ধকার। ভিজে ভিজে ছুটছে সৈন্যদের কনভয়, শহরের কোন এলাকা কোন বস্তি কোন গ্রাম পোড়াতে যাচ্ছে কে জানে! প্রস্তুতিহীন যুদ্ধে আমরা এখন আহত, শেষ পর্যন্ত কি তাই থাকব ? বাতাস ক্লান্ত হয়ে এসেছে, বৃষ্টি থেকে থেকে ঝরছে, আমাকে বেরোতে হবে এখন।

আজ রোববার। আগের মতন ঢাকা শহরে ঘোরা সম্ভব নয়। ইচ্ছার সামনে এখন প্রশ্নবোধক চিহ্ন কিংবা বিস্ময়সূচক চিহ্ন। এখন ইচ্ছা করলেই কি যে-কোন বন্ধুর বাসায় যাওয়া যায় কিংবা গান শোনা যায়, কিংবা গাড়ি নিয়ে ঢাকা ছেড়ে বহুদূর; আগে সে-সবের সঙ্গে জড়ানো থাকতো সবুজ রংয়ের গন্ধ মেশানো হাওয়া, অলৌকিক কৈশোরের আনন্দ, দূরের স্বাদ কিংবা ধানগাছের মধ্যে আশ্বিনের সূচনা। সে-সবের বিনাশ করেছে হত্যাকারীরা। ইচ্ছার অভাবই তো অধীনতা, ইচ্ছা করতে ভয় করাইতো দাসত্ব, কিন্তু মনের মধ্যে বেড়ে ওঠে মুক্তি আকাশের সমান জোড়া, সেজন্য অসংখ্য মুক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বলে নিজেদের ঘোষণা করে, সে-ঘোষণা প্রচণ্ড রৌদ্রে ভীষণ অন্ধকারে প্রবল বৃষ্টিতে কারফিউতে ঘোষিত হয়।

নিউ কলোনি, হাসানুজ্জামানের ফ্ল্যাট। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলো আলো। হাসানুজ্জামান ও আয়েশা সিদ্দিকার ছেলে।

জিজ্ঞেস করলাম, হাসান ভাই আছেন ?

আলোর জবাবের আগেই হাসানুজ্জামান বেরিয়ে এলেন। বললেন পাঁচ মিনিট দেরি হলে মিস করতেন। মানিকগঞ্জ যাচ্ছি। ফিরবো দুদিন বাদে।

জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ ?

হাসানুজ্জামান বললেন, কাজ আছে, তাই।

সিদ্দিকা বললেন, হ্যাঁ বড়ো কাজ। জমি কেনা। সারাক্ষণ ভয় চাকরি চলে যাবে কিংবা ধরে নিয়ে যাবে। সেজন্য জমি কিনতে ছুটেছেন। খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো।

আমি বললাম, রাজ্জাক স্যারের খবর কি ?

একটু চুপ থেকে হাসানুজ্জামান বললেন, মামা ভালোই, গ্রামে লুকিয়ে আছেন। তবে শহরে আসতে চান।

বললাম, স্যারকে বলবেন না আসার জন্য। যদি বিদেশে চলে যেতে চান ব্যবস্থা করা যাবে। একথা বলার জন্যই আপনার কাছে আসা।

হাসানুজ্জামান বরলেন, আমি চলি। আপনি কথা বলুন। আমার বাসা বানাবার নতুন পরিকল্পনা দেখুন।

হাসানুজ্জামান চলে যাবার পর সিদ্দিকা ফের বললেন, কি হবে বলুন তো।

আমি জবাব দিলাম না। ওঁদের ছোট ছেলেটি একা ক্যারাম খেলছে।

সিদ্দিকা বললেন, সাংবাদিক হওয়ার জন্য বিপদ। কখন যে কী হয়। রাত্রে ঘুমুতে পারি না। এদিকে আমার কলেজে একলা যেতে ভয় হয়। যাবার সময় ও নামিয়ে দিয়ে যায়। ফেরার সময় যা ভয় করে। মিলিটারির কনভয় দেখলে এক একদিন মনে হয় বাসায় বুঝি ফিরতে পারবো না।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, কলেজের অবস্থা কেমন ? শিক্ষকরা কী বলছেন ? কিংবা ছাত্ররা ?

সিদ্দিকা বললেন, ছাত্ররা মনে হয় আমাদের ঘেন্না করে চাকরি করার জন্য। শিক্ষকদের কেউ কেউ সুবিধের নয়।

বললাম, কিছু কাগজপত্র বিলির ব্যবস্থা সম্ভব হবে ?

কয়েক লহমা চুপ থেকে সিদ্দিকা বললেন, দিয়ে যাবেন। ব্যবস্থা করব তো। এমন চলতে দেয়া উচিত নয়। উঠবেন না, চা আনছি। ততক্ষণ হাসানের প্ল্যান দেখুন।

হাসানুজ্জামানের এ এক নেশা, বাড়ির নক্সা বানানো। দুঃসময়ে তাঁর সম্ভাব্য বাড়ির নক্সা তৈরি করেছেন। শ্রদ্ধা জাগলো হাসানের ওপর দুঃসময়ে স্বাপ্নের আর আকাঙ্খার নিশেন তুলে ধরেছেন বলে। যত ধ্বস হোক কিংবা মৃত্যু তবু বেঁচে থাকতে হবে জীবনের ঘর তুলে, জীবন যেন বলে ঃ পিতা হও পুত্র হও, ঘর করো। জীবন যেন বলে ঃ হত্যা সত্য নয়, ধ্বংসের দাম নেই।

কি দেখছেন আমার বাড়ি ?

চমকে দেখি সিদ্দিকা, হাতে চায়ের কাপ। নীল মেঘ বুঝি উড়ে উড়ে আসছে জানালার মধ্যে দিয়ে, যতদূর চোখ যায় ঢাকা শহর।

হাসানদের এলাকা থেকে এসেছি নাহার ও মনসুর মুসার ফ্ল্যাটে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, আজিমপুরে। দুপুরের মধ্যে আমার আরো কাজ শেষ করতে হবে।

নাহার এলেন। কুশলাদি শুধোবার পর বললাম, মুসা কই ?

নাহার বললেন আপনি জানেন না দেখছি। ওতো চট্টগ্রামে চলে গেছে। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ডক্টর শরীফের খোঁজ মিলেছে। ভালো আছেন। তারপর ?

বললাম, কাজ করতে হবে আপনাকে। ব্যাংকে যোগাযোগ করবেন আমার নাম করে। কাগজ বিলি করবেন, গেরিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন। আপাতত এই, পরে অন্যান্য বলা যাবে।

নাহার বললেন, করব। ব্যাংকে আমাদের জনা দশেক মেয়ে আছে। সবাই কাজ করতে চায়, জানেন ? আমরা পারবতো শেষ পর্যন্ত ?

বললাম, পারতেই হবে। চলি আজ।

নাহার বললেন, এক্ষুণি যাবেন ? আমাদের ছেলেটার সঙ্গে দুটো-তিনটা কথা বলে যান। সোনা, মামাকে সালাম করো।

নাহারের ছেলের দিকে তাকিয়ে কেন জানি তৃপ্তি বোধ হল আমার। ম-ম কথামালা ছড়াতে ছড়াতে সে ঘরময় ছুটছে। তৈরি হচ্ছে মানুষের ভাষা, শব্দের অসীমে অসীমে।

এদের জন্যই আমরা টিকে যাবো, আমরা মরে গেলেও এরা টিকে থাকবে। জানি রাত্রে ঘুমুতে পারি না, রক্ত রাস্তায় কিংবা নদীতে, তবু যা কিছু এখন স্বীকৃত তা সত্য নয়। আমাদের সবার বুকের মধ্যে একটাই শব্দ ঃ বয়ে চলি নিরন্তর শুনি অনুক্ষণ, আর কিছু নেই, কোথাও আর কিছু নেই নিজেরা উচ্চারণ করি না, কিন্তু জানি। একটা শব্দ বুকে ভরে বাসা থেকে বেরোই আমরা, কাউকে বিদায় দিই ঐ শব্দের ব্যঞ্জানা ভরে, কাউকে ডাকি ঐ শব্দের দুঃখ দেখার জন্য, ঐ শব্দ চতুর্দিকে ঘন্টার মতন বাজে।

ফেরার পথে শব্দটা কাঁধের ওপর শিস দিচ্ছে, পাশের সিটে হাত তুলে দিয়েছি, গাড়ি চালাচ্ছি আলোর দহনে হাওয়ার উজ্জ্বলে, ঢাকার গতকাল, আজ এবং আগামীর মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে ছড়িয়ে।

১৩

কবিরের বাসায়, আমার ও কবিরের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হচ্ছে। এক বিষয়ে আমরা একমত ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জিত হয় নি। সেই একই সমস্যা বাংলাদেশেরও দেখা দেয়া বিচিত্র নয় যদি আমরা কেবলমাত্র পাকিস্তানের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করি, কিন্তু পাকিস্তানের সমাজব্যবস্থা রেখে দিই। নিশ্চয়ই ঐ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়োজিত নয়। আমরা আরো একমত ঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক নিয়ামকের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই কটিঃ মুক্তিযোদ্ধারা পেশাদার সেনাবাহিনী নয়। মুক্তিযোদ্ধারা জনসাধারণের সন্তান, দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত, সমাজব্যবস্থায় রূপান্তর আনয়নে উৎসর্গীকৃত। মুক্তিযোদ্ধার সারিতে আছেন ছাত্র, মজুর, কৃষক, বিভিন্ন পেশাভুক্ত লোকজন। দ্বিতীয়ত যুদ্ধের নিয়মেই দেশের অভ্যন্তরে মুক্তাঞ্চল প্রসারণের দরুণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। তৃতীয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার বৈপ্লবিক সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। চতুর্থত কোন একটি পার্টির নয়, মুক্তি আন্দোলন সারা দেশ ও সমগ্র জাতির সম্পদ। পঞ্চমত মুক্তির লড়াই একই সঙ্গে শ্রেণীযুদ্ধ ও বিপ্লব। ঐ সব নিয়মের তাৎপর্য হচ্ছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং ঐ প্রতিষ্ঠায় সহযোগী হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার বৈপ্লবিক সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। যেহেতু ঐ সহযোগিতার সামাজিক ভিত্তির প্রসারণের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি ও ভূমি দৃঢ়, মজবুত ও সুদূর প্রসারী, সেজন্য বাংলাদেশের বিপ্লব সমগ্র জাতির এবং বিপ্লবীদের, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে মুক্তাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন নির্মিত করে ঐ আদর্শের অংকুর বুনে যাওয়া। ঐ সমাজতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার তাৎপর্য কি ? তাবেদারদের সম্পত্তি বাজেয়াফত ও পুনর্বণ্টন; ভূমিব্যবস্থায় সংস্কার; খাদ্য রেশনিং প্রবর্তন; জনগণের সহযোগিতায় গ্রাম শাসনের ব্যবস্থাপনা। বৈপ্লবিক ন্যায়বিচার; মহামারী অঞ্চলে ঔষধপত্রের ব্যবস্থাপনা; দেশকে যেমন শত্রুমুক্ত করতে হবে সেই সঙ্গে সমাজকে শ্রেণী শাসনের দাপট থেকে মুক্ত

করতে হবে। ঐ কারণে বিপ্লবীদের, মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তব্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তির প্রসারণ করা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে তাবেদারদের সম্পত্তি বাজেয়াফতকরণ সমাজতন্ত্র; ঐ সম্পত্তির পুনর্বণ্টন সমাজতন্ত্র; ভূমি ব্যবস্থায় সংস্কার করে অধিক খাদ্য উৎপাদন সমাজতন্ত্র; মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার প্রতিপালন সমাজতন্ত্র; গ্রামশাসনে গণসহযোগিতার প্রবর্তন সমাজতন্ত্র; বৈপ্লবিক ন্যায়বিচার সমাজতন্ত্র; মহামারী অঞ্চলে ঔষধপত্রের ব্যবস্থাপনা সমাজতন্ত্র; অর্থাৎ কিনা মুক্তাঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির প্রসারণা হচ্ছে ভবিষ্যত বাংলার বীজ স্বরূপ। যেন এক আদর্শ, জনসাধারণের আশা ও উদ্দীপনার আলো, কিংবা যেন এক আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে; জনসাধারণের মধ্যে ঐ আদর্শের বীজ বুনে যেতে হবে, মুক্তাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলে ঐ আগুনের শিখা জ্বেলে দিতে হবে বিপ্লবীদের মুক্তিযোদ্ধাদের। আমাদের মুখ ফেরাতে হবে, ১৯৪৭ সালে নয়, কিংবা ২৫ মার্চ ১৯৭১-এরপূর্বেকার সময়ে নয়, আমাদের মুখ ফেরাতে হবে স্বাধীনতার আগুনে দীপ্ত সমাজতন্ত্রের দিকে।

আমরা আরো একমত : আমাদের কাগজে ঐসব নিয়মিত লিখে যেতে হবে। গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে। গ্রাম ও শহরের নানা জায়গায় কর্মীসংখ্যা বাড়াতে হবে। আমাদের কেন্দ্রে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতসহ বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আরো সংগঠিত করে তুলতে হবে। আমাদের দরকার কর্মী, বাসস্থান, টাকা, ঔষধ, অস্ত্র। আমাদের দায়িত্ব আশা, বিশ্বাস, স্বপ্ন পরস্পরের হাতে তুলে দেয়া। আমাদের কর্তব্য শত্রুদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা।

কবির বললেন, দুদিনের মধ্যে আমি ফের আগরতলা যাচ্ছি। হাসান সাহেবকে বলবেন, ওঁরা যদি যেতে চান তৈরী থাকার জন্য। সিংগারবিল দিয়ে যাবো, সঙ্গে থাকবে গুটিকয় ছেলে। এরপর হয়তো ওপথে যাওয়া সম্ভব হবে না।

গিয়াসের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। গিয়াস ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকে, সদালাপী। সেজন্য ওঁর গতায়ত সর্বত্র অবাধ। গিয়াস জানালেন কোন্ কোন্ শিক্ষক স্বাধীনতার সপক্ষে, কারা বিপক্ষে। ছাত্রদের মধ্যে কারা কেমন ভাবছে। অল বদরদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কাদের আছে। টাকা-পয়সা কোন কোন শিক্ষক পাচ্ছে, ছাত্র এবং কর্মচারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান নয়, সম্প্রতি ধূর্তদের রাজত্ব চলছে। শিক্ষক হলেই কি জ্ঞানী হয়, সৎ হয়, কিংবা দেশপ্রেমিক ? না বোধ হয়।

বললাম, একটা কাজ গিয়াস তোমাকে করতে হবে।

গিয়াস বললেন, কি।

একটু থেমে আমি বললাম, যে-সব শিক্ষক মারা গেছেন এবং কর্মচারি, তাঁদের একটা তালিকা তৈরি করো। কে কবে মারা গেছেন, কোন পরিস্থিতিতে, পরিবারের কে কে বেঁচে আছেন, সবশুদ্ধ। তাঁদের অর্থ সাহায্যের দরকার আছে কিনা জেনে নিও। বিশ্ববিদ্যালয়, ইনসিওরেন্সের পাওনা আদায়ের উপায় কি সে-সবও জেনে নিও।

গিয়াস বললেন, আমিও অমন ভেবেছি। কিন্তু খোঁজ-খবর নিলে সন্দেহ বাড়বে না তো?

বললাম, হয়তো বাড়বে। কিন্তু কাজটা করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। দেশ একদিন না একদিন স্বাধীন হবে। তখন দরকার হবে সঠিক তথ্যের। তোমার তালিকা চার কপি করাবো। চারকপি চারজনের কাছে থাকবে, আমি যদি ধরা পড়ি কিংবা তুমি, অন্য কপি তো টিকে যাবে।

গিয়াস বললেন, আগামী সপ্তাহে তুমি তালিকা পাবে, সেই সঙ্গে টাকার হিসেব।

সকাল থেকেই মেঘ করে আছে। হয়তো বৃষ্টি হবে। আসন্ন বৃষ্টির গন্ধ টের পাওয়া যায়।

মতি এলেন, সঙ্গে একটি ছেলে। পরিচয় করিয়ে দিলেন ঃ নুরুল ইসলাম। বললেন ঃ আমি না পারলে নুরুই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

রিকসা করে ওঁরা দুজন চলে গেছেন। বড়ো রাস্তায় একটা বাস, দক্ষিণে ছুটছে; পিছু পিছু তিনটি মোটর; তারপর মিলিটারি পুলিশ। ঐ দৃশ্য আর দেখতে ইচ্ছা করে না।

মুন্নী রাগ করেছে। আমার অপরাধ ঃ আলাদা বাসা কেন নিচ্ছি না। তিন মাস তো হল। অন্যের বাসায় আর কতো দিন থাকা যায়। মেঝেতে শুতে হয়, গাদাগাদি থাকা।

জবাব দেবার কিছু নেই। কথা সত্য। কিন্তু আলাদা বাসা নেয়া নির্ভর করে নিরাপত্তার ওপর কিংবা নিরাপদ এলাকার ওপর। কেউ কি বলতে পারে ঢাকার কোন এলাকা নিরাপদ। আমি অফিসে কিংবা বাইরে; যেক্ষেত্রে আমাকে প্রায় বাইরে রাত কাটাতে হয়, সেক্ষেত্রে আলাদা বাসা নেয়ার মধ্যে নানান অসুবিধা আছে। কিন্তু মুন্নী কি তা মানে? তার বাসা দরকার, সংসার দরকার, ঘর গোছানো দরকার। রোদে যেমন কুঁড়ি ফোটে, ঐ সবও তার কাছে তেমন।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। টপটপ, শব্দের অজস্র নিনাদ; শব্দের বিষন্ন ঋতু।

অফিসে আসার সঙ্গে সঙ্গে মামুনের টেলিফোন ঃ এক্ষুনি আসুন। মামুনের গলার উদ্বেগ আমার সারামুখে গেল ছড়িয়ে। গাড়ি নিয়ে লিলির বাসায় হাজির হলাম।

মামুনের চোখ ফোলা, কেঁদেছে। থেমে থেমে বলল, আম্মা টেলিফোন করেছেন মামাদের বাসায়। খুব ভোরে এসে আব্বাকে ধরে নিয়ে গেছে।

মামুনকে শুধু বললাম, মন খারাপ করো না। আমি না আসা অব্দি কাউকে কিছু বলো না, দাদাভাইকে তো নয়ই। বাসা ছেড়ে কোথাও যেও না।

আব্বা বেরিয়ে এলেন, জিগগেস করলেন, কি ব্যাপার?

আমি বললাম, কিছু না।

আব্বা কিছু বললেন না। শুধু ঘরে গিয়ে ফের বসলেন।

অফিসে এসে ব্রেন্ডাকে বললাম, চট্টগ্রামের কানেকশান দেয়ার জন্য। ব্রেন্ডা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল কে জানে। বলল, ভেবো না, দিচ্ছি।

লাইন পেলাম, জবাবও পেলাম ঃ সেক্রেটারি সাহেব আসেননি। ব্রেন্ডাকে বললাম, এক ঘন্টা পর ঐ কানেকশান দেয়ার জন্য।

মামুনের পিতা, আমার বড়োভাই, আব্বার বড়োছেলে আজ সকাল থেকে নিখোঁজ। আগে নিখোঁজ হয়েছেন পোর্ট ট্রাস্টের চীফ ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নূর হোসেন। এবার কি বড়ো ভাইয়ের পালা ?

মাথা ঝিমঝিম করছে। আব্বাকে বলার উপায় নেই, আব্বা সহ্য করতে পারবেন না। ঝুনু নোয়াখালী; এখানের ভাই-বোনদের মধ্যে আমি সবার বড়ো, আমাকেই বইতে হবে এ ভার, একা।

শুধু মনে পড়ছে নানা স্মৃতি। বড়োভাই একবার সূর্যাস্ত দেখিয়েছিলেন; একবার কদমের গোল দেহ; একবার গ্রামের মধ্যে শিশির ভেজা ভোর; দেখিয়েছিলেন কি করে পাহাড় কেটে খামার বানাতে হয়। মনে পড়ছে মামুন যখন হয়েছিলো তখন একটা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ পর্যন্ত লিখেছিলাম। মনে পড়ছে মামুনের পরের দুভাইয়ের নামকরণ আমিই করেছিলাম।

এক ঘন্টা পর টেলিফোন করলাম। একই জবাব। ফের টেলিফোন করলাম এক ঘন্টা পর। একই জবাব। ভুলে গেলাম দুপুরে আজুদের বাসায় খেতে যাবার কথা ছিলো। বেলা পৌনে তিনটা নাগাদ আবার টেলিফোন করলাম। এবারে বড়োভাইয়ের গলা; জিজ্ঞেস করলাম, ভালো সব ? বললেন, দশ মিনিট হল ফিরেছি। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ফের আসবে। ছাড়ি ? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, তোমরা কেমন ? আব্বা ? লিলি আরু ? ঝুনুর বউ বাচ্চা ? মামুন ? ভালো থেকো। আমার জন্য দোয়া করো। আব্বাকে বলো, বলো; লাইন কেটে গেলো।

মামুনকে এসে খবর দিলাম। আব্বাকে বললাম সব। শুধু বললেন, আমার ছেলেদের কেউ মারতে পারবে না। দিন রাত আল্লাহর কাছে তাই বলছি।

বিকেল সাড়ে চারটা। জয়নুল আবেদীনের ডেরা। সাদ (সাদউদ্দীন), সিরাজ, মুনিরুজ্জামান বসে। সাদ আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, গোপালগঞ্জের এক গ্রামে লুকিয়েছিলেন। সবে কাল ফিরেছেন।

ফের আলাপ ঃ স্বাধীনতার লড়াই, কর্তব্য, প্রতিরোধ, দালালদের ভূমিকা এইসব নিয়ে।

সাদ বললেন, পৃথিবীতে এই প্রথম একটা স্বাধীনতার লড়াই চলছে যেখানে নেতারা নেই, নেতারা অনুপস্থিত। ফরিদপুরে প্রায় দুর্ভিক্ষ, লোক খেতে পাচ্ছে না।

জয়নুল আবেদীন বললেন, নেতারা নেই, সত্য। তবু লড়াই চালাতে হবে। আর একটা প্রচারপত্র ছাড়তে হবে।

মুনিরুজ্জামান বললেন, দেশ যখন স্বাধীন হবে দেখবেন দালালরাই দেশপ্রেমিক বনে গেছে, নানা পুরস্কার পাচ্ছে।

আমি বললাম, সরকারের দরকার আছে দালালদের। তারা সবার যন্ত্র, আজ্ঞাবাহক, দাস। দেশ স্বাধীন হলেই সরকারের চরিত্র আমূল বদলে যাবে তা সত্য নয়। তার কারণ এক নম্বর ঃ বাংলাদেশ সরকারের নেতারা প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের মধ্যে অনুপস্থিত; দুনম্বর ঃ মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়া হয় না। ঐ শিক্ষা আমরা যদি দিতে পারি তাহলে ভবিষ্যত কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হতে পারে। তাছাড়া প্রতিরোধ দেশের মধ্যে থেকে গড়ে তোলা দরকার, দেশের মধ্যেই মুক্তাঞ্চল দরকার।

জয়নুল আবেদীন বললেন, সবই মানি। তবু একটা কথা কি জানেন ? এখানে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমাদের মতন শিক্ষকদের।

সাদ বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

সিরাজ বললেন, বোধহয় থাকা যাবে না। ভাবনা শুধু স্ত্রী-কন্যা নিয়ে।

আমি বললাম, আমি যাচ্ছি না। এখানেই কাজ করতে হবে। যত যাই হোক এখানেই থাকতে হবে। গ্রামের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। আমাকে কিন্তু এখন উঠতে হচ্ছে।

জয়নুল আবেদীন বললেন, মোজাফফর সাহেবের (ডক্টর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী) সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। ভালো আছেন। ওঁকে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। কাজ করতে পারতেন।

আমরা সবাই বললাম, তাই ব্যবস্থা করুন।

জয়নুল আবেদীন বললেন, প্রচারপত্রটা তাহলে ছেড়ে দিই ?

আমরা বললাম, হ্যাঁ।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা। হাসানের বাসা। মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে গিয়েছি। কি ব্যাপার ?

হাসান আস্তে আস্তে বললেন, আমার দুই ছোট ভাইকে গ্রামে গত পরশু মেরে ফেলেছে। ফারুককে তো আপনি চিনতেন, ডাক্তার। ভালো পশার করেছিল। ফারুকের ছোটটা বি.এস.সি পড়ত। বাড়িতেই ছিলো ওরা। ফারুক ছিলো আবার ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যা, আওয়ামী লীগের মেম্বার। আর্মি আর রাজাকাররা ওদের খোঁজে প্রায়ই গ্রামে হানা দিতো। সে-রাতে ফারুক আর ছোটটা বাড়িতেই ছিলো। রাত্রে গ্রামের মধ্যে জল্লাদরা ঢোকে ঃ জয় বাংলা জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে। সেজন্য কেউ সন্দেহ করেনি। দরজায় টোকা দিয়ে বলেছে ঃ আমরা মুক্তিবাহিনীর লোক। সরল বিশ্বাসে ফারুকরা দরজা খুলে দিয়েছে। রাজাকাররা বলেছে ঃ মুক্তিবাহিনীর লোকজন গ্রামের বাইরে আছে। আমাদের সঙ্গে চলুন। বাড়ির লোকজন মানা করেছে। ফারুকরা শোনেনি। তবু বাড়ির লোকজন পিছু পিছু গেছে ওদের। গ্রামের বাইরে এসে দেখে, পাঞ্জাবী সৈন্যরা দাঁড়িয়ে। ফারুকদের হাত মোড়া দিয়ে প্রথমে বাঁধে, পরে বেয়নেট দিয়ে চোখ উপড়িয়ে ফেলে, পরে গুলী করে।

এক নিশ্বাসে বলে হাসান চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছে হাসান কাঁদছেন ভেতরে ভেতরে।

হাসান ফের বললেন, একা আমি এখন বেঁচে। গতকালই জামালপুর যাবার এত ইচ্ছে করছিল। আর গতকালই খবর পেলাম।

আমি বললাম, চলে যাবার ব্যাপারে বলেছিলেন। ব্যবস্থা করেছি, দুদিনের মধ্যে যেতে হবে।

হাসান বললেন, আমি অন্যভাবে ব্যবস্থা করেছি। শাহনুর করে দিয়েছে। সীমান্তে এক গ্রামে কিছুদিন থাকবো। তারপর আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাবো। আমি বললাম, ব্যবস্থা হলেই হলো। চলি তাহলে এখন।

হাসান বললেন, আমিই এখন আছি, আর কেউ নেই।

আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চাঁদ। জ্বলছে চারধার, বাড়িঘর, গাছপালা। বড়োভাই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে আজকের মতন রেহাই পেয়েছেন। হাসান একা হয়ে গেছেন সংসারে। আমরা সবাই কি আস্তে আস্তে একা হয়ে যাবো ? সব সংসারে কি শেষ পর্যন্ত একজন করে বেঁচে থাকবে ?

রাত্রে বারবার নিতুন, রানী, দেবদাসের কথা মনে পড়ছে। বেঁচে আছে কিনা জানি না।

১৪

বিকেল; চারদিকে নীলিমা, শান্তি, আলো; তার মধ্যে শহরটা নিশ্বসিত, কাছের নদীর ঠাণ্ডা তুলে নিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে না শহরটার মধ্যে যুদ্ধ; মানুষ মরছে, বিদ্রোহ করছে স্বপ্নকে ফের ভালোবাসার জন্য।

মতি এলেন। চৌদ্দই আগস্ট এসে যাচ্ছে। এবারকার এই দিনটির রাজকীয়তা নষ্ট করে দিতে হবে। সেজন্য ঠিক হল ঢাকা শহর গেরিলা সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র ছড়াতে হবে। তাতে থাকবে রিকশা ও স্কুটার ধর্মঘটের ডাক। 'নিরপেক্ষ এলাকায়' বাংলাদেশের পতাকা তুলতে হবে। আর ব্যাপক গুজব ছড়াতে হবে ঐ দিন গন্ডগোল হবে বলে। উদ্দেশ্য স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠান বানচাল করে দেয়া, মানুষের মনে ভিন্ন এক স্বাধীনতার আকাঙ্খা ছিটিয়ে দেয়া। মতি আমাদের পক্ষ থেকে গেরিলাদের সঙ্গে আলাপ করবেন আর রিকশাজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করবেন।

মতি যাবার আগে একটি কাগজ বের করে বললেন, কবির (কুতুব) আপনাকে দিতে বলেছে।

বিভিন্ন থানার লোকসংখ্যা, ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ; গ্রামগুলি ধানখেত বনজঙ্গল বৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠেছে মৃত্যু আর হত্যা ছিটিয়ে ছিটিয়ে।

থানা	গাম	২৫ মার্চ পূর্ব জনসংখ্যা	বর্তমান জনসংখ্যা	ক্ষয়ক্ষতি	মৃতের সংখ্যা
নরসিংদী	নরসিংদী	২০,০০০	১০,০০০	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	২,০০০
	পাচদোনা	২,০০০	২,০০	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	৫২
	রাজাদী	১,০০০	১০	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	১০
শীলামান্দী	তুলসীপুর	১৪,০০০	৭,০০০	আংশিক ভষ্মীভূত	৩৭
	ভাটপাড়া	২,০০০	৫০৫	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	২৭
	মূলপাড়া	২,৫০৭	৫০০	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	১১৩
কালীগঞ্জ	জিনারদী	২,৩০৭	শূন্য	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	২৩০
	গয়েসপুর	২,০০৫	৫০৩	আংশিক ভষ্মীভূত	৫২
	পারুলিয়া	১,৫০২	৩০২	আংশিক ভষ্মীভূত	১২৫
	রবাবরাবান	৩,০২১	১,০০২	আংশিক ভষ্মীভূত	৮০৫
	রাজনগর (বান্দাখোলা)	১,৫০০	৫০০	আংশিক ভষ্মীভূত	২১৫
রূপগঞ্জ	নাগরী	২,০০৩	১,০০৫	প্রায় সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	৪৪৫
	রূপসী	১,৫০০	১,০৫০	৫০% ভাগ ভষ্মীভূত	৩৫
রায়পুরা	হাটুভাঙ্গা	৩,০০৬	১,৫০৭	৫০% ভাগ ভষ্মীভূত	২০২
	বাঙ্গালীনগর	২,০০৬	১৫০	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	৪২৫
বৈদ্যেরবাজার	মরিচারটেক	৭১০	শূন্য	সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত	৪০
আড়াইহাজার	আড়াইহাজার	৩,০০৩	১,২৫০	৭০% ভাগ ভষ্মীভূত	৫৮

বিবরণ তো নয়, অত্যাচারের চিত্র; জনবহুল গ্রাম বসতিহীন, ঘর বাড়ির চিহ্নহীন, মানুষ ছিন্নমূল। ঐ তথ্য কাগজে ব্যবহার করতে হবে, বাইরের পৃথিবীকে জানাতে হবে। তথ্য তো নয়, চিৎকার; গ্রামবাংলার চিৎকার। অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোর মতন তথ্যগুলি জ্বলছে; যারা বলে সব শান্ত তাদের মুখে চাবুক মাড় ক তথ্যগুলি। সেইসঙ্গে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে দিচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যুদ্ধের পর গ্রাম বাংলায় সুখ-শান্তি ফিরিয়ে দিতে হবে। গ্রামের মানুষদের চেতনায় সমাজতন্ত্রের অধিকার বোধ সংক্রমিত করে দিতে হবে। এই হচ্ছে কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার, প্রতিটি বিপ্লবীর। আমার সঙ্গে অসংখ্য মানুষ জড়িয়ে যাচ্ছে, আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলে উঠছে অসংখ্য হৃদপিণ্ড ঃ তোমরা, হানাদারেরা, তোমাদের বোঝার বাইরে। আমি মানুষের মধ্যে দিয়ে মানবিকতার দিকে যাচ্ছি, আর তোমরা মানুষ থেকে পশুর দিকে যাচ্ছো। আমার কেন্দ্রে মানুষ, যাকে ধ্বংস করা যায় না, কখনো না, কোনদিনও না।

বাতি জ্বালিয়ে গিয়াসের সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মীদের হত্যার রিপোর্ট পড়ছি। এতক্ষণ আবোল তাবোল বকে বিটু পাশে ঘুমিয়ে গেছে।

১। ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, দর্শন বিভাগ ঃ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে ছাব্বিশে মার্চ ধলপহরের সময়। মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

একটি মুসলিম পরিবার তাঁর সঙ্গে থাকত; মহিরাটি তাঁর পালক কন্যা, স্বামী সন্তানসহ। এক রিপোর্ট অনুসারে তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। অন্য রিপোর্ট অনুসারে মহিলার স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে। কোন মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাঁরা বলছেন মহিলা সন্তানসহ বেঁচে গেছেন তাঁরাও মহিলা কোথায় এখন আছেন সে-হদিশ দিতে পারছেন না।

২। মোহাম্মদ মুনিরুজ্জমান, রিডার ও অধ্যক্ষ, পরিসংখ্যান বিভাগ ঃ তাঁকে হত্যা করা হয়েছে ছাব্বিশে মার্চ, ধলপহরের সময়। এক ভাই এক ছেলে এবং যশোর থেকে আগত ভাইপোকে একই সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে। কোন মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৩। ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, রিডার ইংরেজি ও প্রভোস্ট জগন্নাথ হল ঃ তাঁকে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে ডেকে এনেছে সৈন্যরা ছাব্বিশে মার্চ ধলপহরের সময়। তাঁর স্ত্রী অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করেছেন ঃ কোথায় ওঁকে নিয়ে যাচ্ছেন? অফিসারটি জবাব দিয়েছে, ক্যান্টনমেন্টে। বিল্ডিংয়ের বাইরে আসার পরপর অফিসারটি ডক্টর গুহ ঠাকুরতাকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছে। জবাব শোনার পর, তাঁকে গুলী করা হয় এবং মৃত ভেবে সৈন্যরা তাঁকে ফেলে রেখে যায়।

খানিকক্ষণ বাদে ডক্টর গুহ ঠাকুরতা তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকতে থাকেন। তাঁর বোধ হচ্ছিল তিনি অবশ হয়ে যাচ্ছেন। মিসেস ঠকুরতা ও তাঁদের সোফার ধরাধরি করে তাঁকে ফ্ল্যাটের ভিতরে নিয়ে আসেন। সাতাশে মার্চ সকাল বেলা তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। একটা গুলি তাঁর গলা ভেদ করে পেট চিরে বেরিয়ে গেছে।

তিনি মারা যান উনত্রিশে মার্চ। তাঁর মৃতদেহ কিংবা কোন ডেথ সার্টিফিকেট দেয়া হয়নি।

যে-ওয়ার্ডে ডক্টর গুহ ঠাকুরতা মারা যান সেই ওয়ার্ডের মেডিক্যাল অফিসার ডেথ সার্টিফিকেট তৈরি করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ মৃতের স্বজনদের কাছে দেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।

পরের মুহূর্তেই আমি দেখতে পাই একটি আর্মি জীপ হাসপাতাল সুপারিনটেনডেন্টের অফিসের সামনে। আমি তখন মিসেস গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তারপরই ওয়ার্ডের মেডিক্যাল অফিসারটি আমাদের জানালেন যে মৃতদেহ রেখে যেতে হবে পোস্ট মর্টেমের জন্য। সমস্ত তথ্য মিসেস গুহ ঠাকুর তার কাছ থেকে পাওয়া।

৪। অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, লেকচারার ফলিত পদার্থবিদ্যা এবং সহ হাউস টিউটর, জগন্নাথ হল ঃ তিনি থাকতেন জগন্নাথ হলে। তাঁকে হত্যা করা হয় পঁচিশে এবং

ছাব্বিশে মার্চের মধ্যকার রাত্রে কিংবা ছাব্বিশে মার্চ সকাল বেলায়। জগন্নাথ হলে সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সময় তাঁকে হত্যা করা হয়।

ডক্টর দেব, তাঁর জামাতা; মনিরুজ্জামান এবং তাঁর স্বজন এবং অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের দেহ খুব সম্ভবত জগন্নাথ হলের খেলার মাঠের গণকবরে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

৫। মোহাম্মদ মুকতাদির, সিনিয়র লেকচারার জিওলজি ঃ তাঁর বাসা ১২/বি, য়ুনিভার্সিটি স্টাফ কোয়াটার, ফুলার রোড। ছাব্বিশে মার্চ সকালবেলা সেনাবাহিনী স্টাফ কোয়ার্টারের প্রাঙ্গনে ঢোকে। মুকতাদির থাকতেন নিচের ফ্লাটে, প্রাঙ্গন থেকে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকজন সৈন্য তাঁকে ডাকে। ভয় পেয়ে তিনি দোতলার ফ্ল্যাটে দৌড়ে ওঠেন। সৈন্যরা তখন ঐ ফ্ল্যাটের মালিককে ডাকে। ঐ ফ্ল্যাটে থাকতেন সৈয়দ আলী নকী, সমাজ বিজ্ঞানের লেকচারার। তিনি ছিলেন বারান্দায়। তাঁকে সৈন্যরা নিচে নেমে আসতে বলে। নিচে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে তিনি 'জয় বাংলায়' বিশ্বাস করেন কিনা। কতক কথাবার্তার পর সৈন্যরা তাঁকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু দুজন সৈন্য তাঁকে পাশ কাটিয়ে তাঁর ফ্লাটে গিয়ে ঢোকে। তারা গুলি করে মুকতাদির এবং নকীর এক ভাইপো এবং শালাকে। মুকতাদির সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। নকীর শালা এবং ভাইপোর মধ্যে একজন হাসপাতালে পরে মারা যায়, অন্যজন সেরে ওঠে। আমি ঠিক নিশ্চিত নই কে সেরে ওঠে। সাতাশে মার্চ মুকতাদিরের মৃতদেহ তাঁর স্বজনেরা নিয়ে যায়।

জানা গেছে, সৈন্যরা নকীকেও গুলী করতে উদ্যত হয়েছিল। তাঁর ফ্লাটে গুলীর শব্দ শুনে তিনি হতচকিত হয়ে যান এবং একতলা থেকে নিজের ফ্লাটে ফিরে আসনে। তাঁকে সৈন্যরা ছেড়ে দেয়, কারণ তাঁর মেয়ে উর্দুতে বলেছে ঃ কেন আমার আব্বাকে তোমরা মারছ ?

৬। মোহাম্মদ সাদেক; শিক্ষক য়ুনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল, বাসা ১১/এ ফুলার রোড, নিচের তলার ফ্ল্যাট।

তাঁকে হত্যা করা হয় ছাব্বিশ তারিখ সকালবেলায়। এক রিপোর্ট অনুসারে, সৈন্যরা তাঁর দরজায় বাড়ি মারতে শুরু করে। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে ঃ জয় বাংলার অর্থ কি ? তারপর তাঁকে গুলি করে।

অন্য রিপোর্ট অনুসারে তিনি যখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন তখন বাইরে থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। তাঁর গুটিকয় বন্ধু সাতাশ তারিখ তাঁর ফ্ল্যাটের পিছনে তাঁকে কবর দেন।

৭। ডক্টর ফজলুর রহমান খান, সিনিয়র লেকচারার মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বাসা ২৩ নং বিল্ডিং, য়ুনিভার্সিটি কোয়ার্টার, দোতলার ফ্ল্যাট, ইকবাল হলের উত্তর কোণে।

জানা গেছে যে পরিত্যক্ত রেল সড়কের বস্তির বাসিন্দারা ঐ বিল্ডিং এর ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সৈন্যরা তাঁদেরকে ছদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।

এক রিপোর্ট অনুসারে, ছাদে কয়েক সপ্তাহ ধরে লাশ পড়েছিল। ছাদ থেকে নামার পথে সৈন্যরা সব ফ্ল্যাট তছনছ করে দেয়। কিন্তু কেন তারা ডক্টর ফজলুর রহমান এবং তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ভাইপোকে হত্যা করে তার কারণ জানা যায়নি। তাঁদের মৃতদেহ শোবার ঘরের মেঝেতে পড়েছিল। তাঁর স্বজনেরা তাঁদের আজিমপুর গোরস্তানে কবর দেয়। ডক্টর খান সদ্য বিবাহিত। স্ত্রী ইংল্যান্ডে স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চশিক্ষারত।

৮। এ আর খান খাদেম, সিনিয়র লেকচারার পদার্থবিদ্যা; বাসা ঃ ঢাকা হল (শহীদুল্লাহ হল) সংলগ্ন একটি লম্বা বিল্ডিং। ঐ বিল্ডিং এর এক কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মীরা থাকতেন। বয়েসে তিনি প্রবীণ, পদার্থবিদ্যায় তাঁর খ্যাতি ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি প্যারোনিয়ায় ভুগছিলেন, খুব সম্ভব সিজোফ্রেনিয়ায়ও।

৯। শরাফত আলী, লেকচারার গণিতশাস্ত্র, বাসা একই। জানা গেছে যে, একটা পটকা কিংবা মলোটভ ককটেল সৈন্যদের ওপর ছোঁড়া হয়েছিল। খুব সম্ভব ছোঁড়া হয়েছিল মিলনায়তন কক্ষ থেকে, ঐ কক্ষটি ছিল খাবার ঘরের দোতলায়।

সৈন্যরা প্রথমে ঐ দালানের জানালা তাক করে শেলিং করেছিল যেখানে খাদেম এবং শরাফত আলী থাকতেন। পরে, সৈন্যরা দোতলায় উঠে সবাইকে হত্যা করে।

সবশুদ্ধ পাঁচটি মৃত দেহ পাওয়া যায়। দুটি দেহ খাদেম ও শরাফত আরীর বলে শনাক্ত করা হয়।

অন্য মৃতদেহটি পাওয়া যায় জুলজি-র ফেলো রণবীর পাটরার কক্ষে। কিন্তু দেহটি শনাক্ত করা যায়নি। এক রিপোর্ট অনুসারে পাটরা মারা গেছেন। অন্য রিপোর্ট অনুসারে পঁচিশে মার্চের কয়েকদিন আগে তিনি বাড়ি চলে যান। একজন মেহমান তাঁর সঙ্গে থাকতেন, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

বাকি দুটি মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি। খুব সম্ভব কেউ মৃতদেহগুলি কবর দেয়ার জন্য নেয়নি। পরে মুদ্দাফরাসরা এসে মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলেছে।

এরপরে হাউস টিউটরদের বাড়িগুলিতে শেলিং করা হয়। দুজন হাউস টিউটরের বাড়িতে সৈন্যরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে। তাঁরা বহু কষ্টে পালিয়ে বাঁচেন।

১০। ডক্টর সাদাত আলী, সিনিয়র লেকচারার, ইন্সটিটিউট অব এডুকেশন এবং হাউস টিউটর জিন্নাহ হল ঃ সাতাশে মার্চ তিনি পরিজন শুদ্ধ ঢাকার বাইরে চলে যান। ছাব্বিশে এপ্রিল তিনি ঢাকায় আসেন ; তিনি বেতনের চেক ভাঙ্গান, কিন্তু বাড়ি আর ফিরে যাননি।

১১। আবদুল খালেক, মালী, রোকেয়া হল ঃ তাঁকে হত্যা করা হয় ২৫-২৬ মার্চে। স্ত্রী এবং চার বছরের একটি ছেলে আছে। স্ত্রী গুলী লেগে পঙ্গু। এখন স্ত্রীর পিতা তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তিনি থাকেন মাউতাইলে, ঢাকার কাছের গ্রামে।

১২। চুন্নু মিয়া, মালী, রোকেয়া হল ঃ তাঁকে হত্যা করা হয় ২৫–২৬ মার্চে। স্ত্রী, দুই ছেলে, তিন মেয়ে আছে। বড়ো ছেলের বয়স বারো। এখন এঁরা আছেন দাউদকান্দি থানার মাহমুদপুর গ্রামে। রক্ষণাবেক্ষণ করছেন মৃতব্যক্তির বড়ো ভাই।

১৩। মঈনউদ্দীনের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, পুত্রবধু ঃ মঈনউদ্দীন রোকেয়া হলের দারোয়ান। ২৫-২৭ মার্চের মধ্যে তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে ও পুত্রবধুকে হত্যা করা হয়। তাঁর ঘরের সব জিনিশ এবং সাতটি গরু লুট করে নিয়ে যায়। চার ছেলে বর্তমানে তাঁর বেঁচে আছে।

১৪। নমী, রোকেয়া হলের দারোয়ান ঃ ২৫-২৬ মার্চের মধ্যে তাঁকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি শুদ্ধ হত্যা করা হয়। এক ছেলে, বয়েস ষোল, বুলেটের আঘাত থেকে সেরে উঠেছে, কিন্তু কোন কাজের জন্য খুব সম্ভব অকেজো হয়ে গেছে। উপাচার্য ভবনের একজন মহিলা মালী বর্তমানে ছেলেটির রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

১৫। শামসুল হক মোল্লা ওরফে শামসুদ্দীন, দারোয়ান ইকবাল হল ঃ ২৫ মার্চ তাঁর পাহারার কাজ ছিল। ঐ রাতেই তাঁকে সৈন্যরা হত্যা করে।

ইকবার হলের মধ্যে ছোট একটি টিনের শেড বানিয়ে তিনি তাঁর পরিজনদের নিয়ে বাস করতেন। ঐ শেড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে এবং পরিজনদের বের করে দেয়া হয়েছে। ঘরের জিনিশপত্র সব লুট করা হয়েছে। তাঁর ছেলেদের নীলখেতে দুটি দোকান ছিল। সে-সবও গেছে।

স্ত্রী, পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে আছে। বড়োটির বয়স বাইশ, ছোটটির বয়স এক। বড়ো ছেলের নাম আবদুস সাত্তার, তাকে ইকবাল হলের দারোয়ানের চাকরিটি দেয়া হয়েছে। সে বর্তমানে পরিবার প্রতিপালন করছে।

১৬। মধু, য়ুনিভার্সিটি ক্যান্টিনের ক্যাটারার ঃ ২৬শে মার্চ সকালবেলায় তাঁকে, তাঁর স্ত্রী, বড়ো ছেলে ও পুত্রবধুসহ হত্যা করা হয়।

সাত/আটটি ছেলে মেয়ে। একজন বাদে বাকি সব ভারতে চলে গেছে। যে থেকে গেছে সে ছোট মেয়ে, তাঁকে মধুর শ্বশুর পালক নিয়েছেন। শ্বশুর তাঁর একমাত্র মেয়েকে হারিয়েছেন।

১৭। খগেন, দর্শন বিভাগের বেয়ারার; তাঁকে হত্যা করা হয় ২৬ মার্চ। তাঁর স্ত্রী নোয়াখালীতে পৈত্রিক বাড়িতে চলে গেছেন ছেলে-মেয়ে নিয়ে। কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৮। পিয়ার মোহাম্মদ, রেজিস্ট্রারের পিওন ঃ ২৭ তারিখ তাঁকে ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রাস্তায় হত্যা করা হয়। তিনি ঢাকা ছেড়ে পরিজন শুদ্ধ পালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্ত্রী, দু'বছরের এক ছেলে, তিন মেয়ে আছে। স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। বর্তমানে পরিবারটিকে প্রতিপালন করছেন বিধবার এক ভাই। ঐ ভাইকে পিওনের চাকরিটি দেয়া হয়েছে।

য়ুনিভার্সিটি ক্লাবে পাঁচটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। সাদউদ্দীনের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরে আমি জানাব।

গিয়াসের রিপোর্ট শেষ। বাইরে অগাস্টের রাত। বন্ধ জানালার পরপারে আকাশ, চাঁদ জ্বলছে কি ? আমার তথাকথিত বাড়ি, মাতা-পুত্র ঘুমিয়ে ; আমার চোখের সামনে দেয়াল, ওপাশে বাতাসের বিশাল শব্দ। আর আমার মনের মধ্যে জপমন্ত্র ঃ গিয়াস গিয়াস, আমরা বেঁচে থাকব।

১৫

কতগুলি অনুভূতি ঃ

১। রোজই আমি নদীর কাছে যাচ্ছি। গলায় আমার শব্দ নেই, নদীতে ভেসে যাচ্ছে মাথা, বন্ধ চোখ, গান করছে।

অমন অনুভূতির উৎসে আছে বুড়ীগঙ্গায় ভেসে যাওয়া মৃতদেহের স্রোত। বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে হাত-পা বেঁধে ইপিআর, পুলিশ আর যুবকদের নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে হানাদারেরা। বাংলাদেশের নদীতে ভেসে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ, লাশ তো নয় বেহুলার ভেলা, ফের বেঁচে উঠবে, ফের কথা বলবে, ফের কাজ করবে, কিন্তু কবে, কবে ?

২। রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছি। ক্রুশবিদ্ধ মানুষের পেরেক খুলছি। সবার চোখে কান্না, কিন্তু ভয় নয়। সবাই ফিসফিস করছে ঃ ও কি আমাদের হৃদয় থেকে পেরেক খুলে দিচ্ছে!

তরাঘাটে হানাদারেরা মানুষদের গাছে গাছে গেঁথে হত্যা করছে। পাশে নদী, গাছে পেরেকবিদ্ধ মানুষ, কাছে গ্রাম, বাংলাদেশের গ্রাম থেকে রক্ত ঝরছে। ভয় নয়, মানুষ বরং সাহসী হচ্ছে, পেরেকবিদ্ধ সত্য তাদের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলছে বাংলাদেশ, নদীর টানে ভেসে যাচ্ছে দিকে দিকে।

৩। যুদ্ধশেষে যোদ্ধারা ফিরে চলেছে দেশে। কেউ হয় তো কিনেছে সামান্য কিছু বোন কিংবা মার জন্য; কিন্তু প্রায় সবার পকেট শূন্য, হয়তো তাদের হৃদয়ের মতন। কি এসে দেখবে, কি এসে ফেরত পাবে ? তবু তারা চলেছে ফিরে নিজের গন্তব্যে, গ্রামে কিংবা শহরে। যে-সবের মধ্যে দিয়ে তারা গেছে সে-সবের চেয়ে ভয়ংকর তাদের যন্ত্রণা, বাচ্চাদের কান্না, বাবার পেনশনে সংসার চলে না, আর প্রতিশ্রুতি, হয়তো যুদ্ধের শেষ নেই। বেঁচে থাকার উপকরণে স্বাধীনতা কি পরিণত হবে যুদ্ধশেষের বাংলাদেশে ?

জাহানারা ইমামের বাসা। মহিলার সঙ্গে আলাপ করছিলাম টাকার জন্য। জানালেন অন্য মাধ্যমে তিনি নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন। তাঁর বাগান রঙ্গীন হয়ে আছে। প্রশংসা করতেই তিনি বললেন ঃ কিছু ফুল তুলে দিই ? কেন জানি বললাম ঃ না ফুলগুলো বেঁচে থাক। কোন কিছু ছিঁড়তে কিংবা নষ্ট করতে এখন কষ্ট হয়। গাছ দেখে ফুল দেখে মমতা জাগে। সে কি মানুষ নষ্ট হচ্ছে বলে ? বাঁচা শব্দটি এখন জীবনের

অন্তিমতম প্রান্তে অবস্থিত, আলৌকিকে অন্তর্ভুক্ত। আগে বেঁচে থাকা স্বাভাবিকের অঙ্গ ছিল, ছিল অধিগম্য ও ব্যবহার্য, এখন মৃত্যুর মুঠির মধ্যে শব্দটির স্থান।

গিয়াস পাঠিয়েছেন যাঁদের টাকা জরুরি তাঁদের তালিকা ও ঠিকানা।

১। মিসেস মুকতাদির ঃ অন্তসত্তা, মার সঙ্গে আছেন, নয়া পল্টনে।

২। মরহুম শরাফত আলীর পিতা ঃ জনাব আলী আজম, গ্রাম ঃ দক্ষিণ রামপুর, পোস্ট অফিস ঃ আহমদ নগর, থানা কোতওয়ালী, কুমিল্লা। কিংবা শহীদুল্লাহ ঃ মরহুমের ভ্রাতা, প্রযত্নে ঃ ফাদার দানিয়েল কেনার্ক, আওয়ার লেডী ফাতিমা কনভেন্ট, কুমিল্লা। পোষ্য সংখ্যা সাত, সবারই দেখা শোনা করতেন শরাফত আলী।

৩। মিসেস সাদত আলী, প্রযত্নে জনাব ইদ্রিস আলী বেপারি (পিতা), গ্রাম ও পোস্ট অফিস ঃ হোসেইনপুর, ময়মনসিংহ।

৪। মিসেস সাদেক, প্রযত্নে আনোয়ার হোসেন, সিরামিক বিভাগ, পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান গবেষণাগার, ঢাকা।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মীর পরিবার পরিজন।

মামুন যোগাড় করেছে জোয়ান বায়িজের রেকর্ড ঃ উই শেল ওভারকাম। রাত্রিবেলা শুনছি হাসিম সাহেবের বাসায়, আমি আর মামুন আর পারভেজ। ঘর জুড়ে শব্দ আর ধ্বনির সুখ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বাস করা কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক। কোনো আয়াস ছাড়াই সেই বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন বায়িজ, শব্দের মধ্যে দিয়ে শেখালেন ঃ জয়ী হবই। যাই হোক না, যাই ঘটুক না, মানুষ এক ঐকান্তিক ও অদম্য কর্তব্যসাধক, মানুষ কয়েদের সীমা মানে না। হৃদয় সঞ্জাত এক বেদনাবোধ ঘর জুড়ে উন্মীলিত, তা-ই কি বিবেক নয়, সেই বিবেক যন্ত্রণার ভারে পিষ্ট হতে হতে কেবলি সম্ভবপরতার সীমা পেরিয়ে চলেছে। মনের মধ্যে বারে বারে ফিরে ফিরে ঘুরছে কথাকটি ঃ যেন এক অস্ত্র হাতের মুঠোয়।

শনিবার, অফিস যাবার পথে আজুদের ওখানে। বলেছিলাম ঔষধ, কাপড় জোগাড় করে রাখার জন্য।

আজু বলল, ডক্টর রাব্বীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ঔষধ নিয়মিত দেবেন। কাপড় যোগাড় করছি। কাল একবার এসো সকালবেলার দিকে, কথা আছে।

ঔষধের দরকার খুব বেশি। কমান্ডোদের দরকার বাদেও নরসিংদী এবং মানিকগঞ্জের চর অঞ্চলে কলেরা শুরু হয়েছে। যে-সব কমান্ডোদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কিংবা যে-সব যায়গায় কর্মী সংগঠন তৈরি হয়েছে সব যায়গায়ই ঔষধের দরকার। মানুষের অসুখ লেগেই আছে। গিয়াসের ভাই ডাক্তার, রশিদ, খবর পাঠিয়েছেন, ঢাকার চারপাশে ছুটির দিন গিয়ে চিকিৎসা করতে গুটিকয় ডাক্তার রাজি হয়েছেন।

মতি এসেছেন। জানালেন চৌদ্দই আগস্টের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। শহীদ মিনার, কার্জন হল, আদমজী কোর্টের সামনে কাকভোরে বাংলাদেশের পতাকা তোলা হবে।

স্টেডিয়ামের অনুষ্ঠান বানচালের ব্যবস্থাও হয়েছে। গুজবে কাজও হয়েছে। প্রচারপত্র ছড়ানো হয়েছে। ছাত্র সংগঠনের কিছু কর্মীর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হয়েছে, কৃষক সমিতির সঙ্গেও। কিন্তু শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে। কাগজ বার করার প্রস্তুতিও প্রায় শেষ। তবে দালালরাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মতির কথাগুলি ভাবছি। ঢাকা ছোট শহর, সবাই সবাইকে চেনে। এর মধ্যেও ভোল পাল্টাবার চেষ্টা চলছে। একজন সরকারি কর্মচারি কবি; এক জন সরকারি কর্মচারি-অভিনেতা; একজন কৃষি দপ্তরে কর্মচারি; পিন্ডি ফেরৎ একজন অধ্যাপক; লাহোর ফেরৎ একজন সাংবাদিক; শেখ মুজিবের ঘনিষ্ট একজন সাংবাদিক; আরো নাম মনে পড়ছে, পাকিস্তান প্রেমিক হয়ে উঠেছে। কেউ এক হাজার ট্যাকর চেকের লোভে, কেউ প্রমোশনের লোভে, কেউ ইনামের লোভে পাল্লা দিয়ে আত্মবিক্রয় করছে। কিন্তু এদের কাউকে তো কপালে বন্দুক চেপে আত্মবিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়নি। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কলকাতার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। দু'নৌকোয় পা দিয়ে দেশপ্রেমে দীক্ষা নিচ্ছে। দেশ, সে পাকিস্তান থাকুক কিংবা বাংলাদেশ, দেশপ্রেমের মুনাফা অর্জন করতেই হবে। হয়তো ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সরকার এদেরকেই বেছে বেছে পুরস্কৃত করবে, হয়তো ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য, কিংবা তোষামোদে শ্রেষ্ঠতা অর্জনের জন্য, অথবা পুরানো সম্পর্কের জন্য। কিন্তু মানুষের ঘৃণার নরকের বাসিন্দা এরা থাকবে চিরদিন; ঘৃণা করাই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে ঃ ঘৃণা। আমরা দেশ ছেড়ে পালাইনি, দেশের মধ্যে থেকে লড়াই করে চলছি, সবাই ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আমরা ভুলব না। হে পাকিস্তান প্রেমিক, হে চেক প্রেমিক, হে প্রমোশন প্রেমিক, হে ইনাম প্রেমিক ব্যক্তিরা, আমাদের ভোলাবে কি করে ? এদের লক্ষ্য করেই কি আঁরাগ লিখেছেন ঃ স্বাধীন হওয়ার দিন কর্তা বইছে ধামাধরা খৈ।

চমকে দেখি আমিনুল (আমিনুল ইসলাম)। খুশী লাগছে। আমিনুল বললেন কোথায় আছেন কি করছেন এই সব। মালীবাগের বাসা ছেড়ে হাতীরপুলের কাছে এক আত্মীয়র বাসায় আছেন। জিগগেস করলেন, কোথায় আছি। বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলাপ হয়। ঠিক করলাম আমিনুলের বাসায় গিয়ে কথাবার্তা বলব।

টাকা দরকার। মকবুলার রহমান সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মীদের পরিজনদের কথা শুনে রাজী হলেন। শুধু বললেন ঃ সাবধানে থাকবেন।

মুলধন বিনিয়োগ কেন্দ্রের মতিন ভাইয়ের সঙ্গেও কথাবার্তা বললাম। তিনি বললেন টাকা নিয়মিত যোগাড় করে দেবেন। আরো বললেন ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা দরকার। পাকিস্তানের ভুলের মাশুল থেকে শিক্ষা নেয়া জরুরি। দেশ স্বাধীন হবেই, কিন্তু স্বাধীনতা নিয়ে কী আমরা করব সেই বক্তব্য স্পষ্ট করা দরকার।

সিদ্দিকী আরো গুটিকয় দুঃস্থ পরিবারের তথ্য দিলেন।

১। সাবিত্রী সাহা, প্রযত্নে গৌরচন্দ্র সাহা, পোস্ট অফিস ও গ্রাম এলাসিন, টাঙ্গাইল; সাহায্য দরকার।

২। বনবিহারী সাহা, পোস্ট অফিস ও গ্রাম দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল; ঘরবাড়ি ভস্মীভূত, সাহায্য দরকার।

৩। বিনোদ বিহারী সাহা, ঐ

৪। গগনেন্দ্রনাথ সাহা, ঐ

৫। লক্ষ্মীকান্ত পাল, পোস্ট অফিস ও গ্রাম পাকুলিয়া, টাঙ্গাইল; সাহায্য দরকার।

৬। হাবিবুল্লাহ খান, পোস্ট অফিস ও গ্রাম ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল ; ঘরবাড়ি ভস্মীভূত, সাহায্য দরকার।

৭। মতিউজ্জামান খান, ঐ

খবর একটাই। তথ্য একটাই। সারা দেশ জুড়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলছে। মানুষগুলিকে বাঁচানো দরকার। কিন্তু টাকা কই। টাকা চলে যাচ্ছে ওপারে। যাকেই জিগগেস করি জবাব পাই ঃ টাকা দিচ্ছি। দেশের মধ্যেকার মানুষগুলি সম্বন্ধে কি কারো কেনো দায়িত্ব নেই ?

রাস্তায় জাফর ভাইয়ের (সিকান্দার আবু জাফর) সঙ্গে দেখা। বললেন ঃ কথা আছে। নানা আলাপ করা দরকার।

বললাম, আসবো।

সারারাত বৃষ্টি। ভোরে ওঠে দেখি বৃষ্টির টুপটাপ। অনেকক্ষণ বৃষ্টি দেখলাম, বিটু পাশে বসে।

গাড়ি বিকল। রিকশায় ভিজে ভিজে আজুদের বাসায়। মীরা বাড়ী থেকে চিঠি লিখেছে ঃ চলে আসতে চায়। রাজাকারদের উৎপাত সাংঘাতিক বেড়েছে। ফেরদৌস মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছে। বাবা মা কেউ জানেন না। ফেরদৌসের খোঁজে কিংবা মীরা একা বলেই হঠাৎ রাজাকাররা এসে উপস্থিত হয়। রাজাকাররা আবার বিহারী, গ্রামের পাশে তাদের বসত। গ্রামে জিনিষপত্র কিছু পাওয়া যায় না, দাম বেড়েই চলেছে। মানুষজন ফলমূল কচু খেয়ে থাকছে। আর বেড়ে চলেছে ভিখিরীর সংখ্যা।

বাসায় এসে শুনি আরু এসেছে। খবর দিয়ে গেছে সাদউদ্দীনকে গ্রেফতার করেছে। মন বিষণ্ন হয়ে গেলো। বৃষ্টির মধ্যে ফের লিলির বাসায়। আরুকে জিগগেস করলাম সাদউদ্দীন বাদে আর কেউ গ্রেফতার হয়েছে কিনা। আরু বলল, চৌদ্দই আগস্ট, ছুটির দিন বলে করিম সাহেবের বাসায় যাচ্ছিলাম। ডিপার্টমেন্টের বেয়ারার সঙ্গে দেখা, বলেছে ঃ সার যাবেন না। সাদউদ্দীন সাহেবকে ধরে নিয়ে গেছে।

কেনো জানি মনে হলো আরো অনেককে গ্রেফতার করেছে। লিলি, আরু, মামুন বাসায় থাকতে আজ বারণ করলো।

লিলি বললো, পাটোয়ারী সাহেব (নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী) খবর পাঠিয়েছেন। নওয়াব মামার ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। বড়োমামা আশুর শ্বশুর বাড়িতে। মাজ্জু কলকাতায় ছিলো, এখন তুরায়, ট্রেনিং নিচ্ছে। পাটোয়ারী সাহেব যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন।

বিটুকে নিয়ে বাসায় এলাম। মুন্নী জিজ্ঞেস করল আর কিছু জানতে পেরেছি কিনা। আইয়ুব বলল, সকালবেলা একটা লোক জিজ্ঞেস করেছে এ ফ্ল্যাটে কে কে থাকে।

বললাম, রাত্রে বাসায় থাকব না। জয়নুল আবেদীনের ওখানে যাচ্ছি।

বেরোবার সময় বিটু বলল, তুমি না বলেছিলে রাত্রে থাকবে, গল্প শোনাবে।

জয়নুল আবেদীন বললেন, আপনার ওখানে যাব বলে ঠিক করেছি। শুনেছেন তো ?

বললাম, সাদের খবর শুনেছি।

জয়নুল আবেদীন বললেন, গিয়াস টেলিফোন করেছে। আবুল খায়েরকেও ধরেছে। মনে হয় আরো কয়েকজনকে। রাতে বাসায় থাকব না, আপনিও থাকবেন না। সিরাজের ওখানে চলুন। ওকে খবরটা দেয়া দরকার। একটা গাড়ি পেয়েছি ; যেখানে রাত কাটাবেন কাছেই নামিয়ে দেব। কোন বাসায় উঠলেন আমি জানতে চাই না, দেখতেও চাই না, দুর্বল মুহূর্তে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। যদি ধরা পড়ি আমাকে হাজার জিজ্ঞেস করলেও বলতে পারব না কোথায় আপনি গেছেন। কারণ আমি তো সত্যি সত্যি জানি না।

সিরাজের আস্তানায়। সিরাজ জানালেন ঃ চারজনকে তেরো ও চৌদ্দই অগাস্টের মধ্যবর্তী রাত্রে গ্রেফতার করেছে। ইতিহাসের আবুল খায়ের, সমাজবিজ্ঞানের সাদ উদ্দীন, বাংলার রাফিক আর অংকের শহীদুল্লাহ।

জিজ্ঞেস করলাম, সিরাজ তুমি কি করবে ?

সিরাজ বললেন, এই আস্তানার ঠিকানা কেউ জানে না। তাই এখানে থাকব।

বললাম, তাহলে এক কাজ করো। আগামীকাল ক্যাম্পাসে যোগাযোগ করে জানার চেষ্টা করো যাঁদের ধরে নিয়ে গেছে তাঁদের বাসায় কোন অসুবিধা আছে কিনা।

কাকরাইলে আমাকে নামিয়ে জয়নুল আবেদীন চলে গেছেন। ফের আজুদের বাসা। সব কথা বলতেই আজুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। শুধু বলল, ওরা ফের শিক্ষকদের গ্রেফতার শুরু করেছে।

সারারাত গুলির শব্দ থেকে থেকে। আজুর চোখে ঘুম নেই। একটা কথা বারবার বলছে, আমাকে জেগে থাকতে দাও। আমার এখান থেকে তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে আমি সহ্য করতে পারব না।

আজু কাঁদছে। ফারুক ঘুমুচ্ছে। টেবিল, চেয়ার, বইয়ের শেলফ, সারা বাড়ি ঘুমুচ্ছে। শুধু গুলির শব্দ আর কান্না।

তিন দিন বাদে আমাদের কাগজের প্রথম সংখ্যা বেরোল ঃ স্বাধীনতা। প্রথম সংখ্যাতে আছে ঃ সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ বক্তব্য একটাই; বিশেষ নিবন্ধ ঃ বঙ্গবন্ধুর বিচার; খবর ঃ চারটি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাচার, মুক্তি বাহিনী সমাচার।

সম্পাদকীয় নিবন্ধের শেষ লাইন ঃ স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক।

১৬

ক মারা যাচ্ছে, খ মারা যাচ্ছে, গ মারা যাচ্ছে; বাংলা ভাষায় যত অক্ষর আছে সব অক্ষরের নামধারী মানুষেরা মারা যাচ্ছে।

ক যুদ্ধ করছে, খ যুদ্ধ করছে, গ যুদ্ধ করছে; বাংলা ভাষার যত অক্ষর আছে সব অক্ষরের নামধারী মানুষেরা যুদ্ধ করছে।

জেটির ওপর আমরা দাঁড়িয়ে; শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন আর আমি; সপরিবারে হাসান চলে যাচ্ছেন। লঞ্চে আর জেটিতে টগবগ করে ফুটছে মানুষের কণ্ঠস্বর, কিন্তু আমরা কজন কথা বলতে ভুলে গেছি। বুড়িগঙ্গায় আসনপিঁড়ি হয়ে আছে নৌকোর সার; লঞ্চের সিটি বাজছে, শামসুর রাহমান আর ফজল কিছু টাকা গুঁজে দিলেন হাসানের হাতে, হাসান হাত মেলালেন আমাদের সঙ্গে, লঞ্চে উঠে গেলেন, হাসান চলে যাচ্ছেন অজানার থাবার মধ্যে, বন্দুকের নলের তলার মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছেন ভারতের উদ্দেশ্যে; আমরা থেকে গেলাম বধ্যভূমিতে।

ফেরার পথে কারো মুখে রা নেই। মধ্য দুপুরের পচনশীল নৈঃশব্দের দিকে গাড়ি চালাচ্ছি। আমাদের মনের মধ্যে সেদ্ধ হচ্ছে অজস্র কথা। একের পর এক দিন পেরিয়ে যাবে, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভয় আর সাহস যুগপৎ ঝুরি চালিয়ে দেবে, আমাদের চারপাশে রাইফেলের আর মেশিনগানের কঠোর নিনাদ জেগে উঠবে, পাকিস্তানের পতনধ্বনিতে বাংলাদেশ থরথর করে কেঁপে উঠবে, আর আমাদের পাঁজর এবং হৃদপিণ্ড ভেদ করে দিগদিগন্তে গর্জে উঠবে বিশাল বাংলাদেশ। আর ততদিন শস্যের ভাণ্ডার লুট হোক, ঢাকা শহরের সমস্ত লাশ চালান হোক বুড়িগঙ্গায়, বস্তির সমস্ত ইজ্জত নষ্ট হোক, আর পাকিস্তানের সমর্থকেরা নিশীথ পেঁচকের চিৎকার হানুক। আর ততদিন অমর অস্থি এবং স্বাধীন খুলির ফসলের চারপাশে ক্ষিপ্ত মানবসমাজ জেগে উঠুক, জেগে উঠুক কারবালায়, কুরুক্ষেত্রে হাসান, শামসুর রাহমান, ফজল এবং আমি। আর ততদিন শানানো বর্শার অগ্রভাগে, বিচ্ছিন্ন আঙ্গুলে, ভূমিহীন কৃষকের লুণ্ঠিত শস্যের পুরোভাগে জেগে থাকুক আমাদের লেখা। আর ততদিন ক্ষতস্থানে ঘুরে বেড়াক জন্তু ও জুডাসেরা। তাই এই বেঈমানী বধ্যভূমিতে আর উদাস তাজিয়া নয়, হে অবশিষ্ট নরপতি তোমরা আর নও ঃ বিপ্লবের হিংসা দু'চোখের মণি করে আমরা এখন অনন্ত অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

আহসান (আহসানুল হক) এবং রশিদুল হাসানকে গ্রেফতার করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রাসের রাজত্ব। আহসান এবং রশিদুল হাসানের পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। গিয়াস, সিরাজ, মুনিরুজ্জামানের ওপর ভার দেয়া হয়েছে আর্থিক যা কিছু সম্ভব করার।

'স্বাধীনতার' দ্বিতীয় সংখ্যা বেরিয়েছে। এ সংখ্যায় আছে মূল প্রবন্ধ ঃ দীর্ঘ মেয়াদী সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন; সম্পাদকীয় ঃ দেশের জনগণই মূল শক্তি; বিশেষ প্রবন্ধ ঃ রাজনৈতিক ধোকাবাজী; জনযুদ্ধ, গণবাহিনী; রিলিফ নয় মৃত্যুবাণ; মুক্তিবাহিনী সমাচার। মূল প্রবন্ধে আমরা লিখেছি ঃ বাংলাদেশের মানুষ আজ জাগ্রত। দুধর্ষ ও নির্মম হত্যাকারীর বিরুদ্ধে সে আজ রুখে দাঁড়িয়েছে। তার সম্বল সামন্য কিছু অস্ত্র ও অগণিত মানুষ। এ সংগ্রামে বাংলাদেশের মানুষের জয় অনিবার্য ও অবধারিত। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ হানাদারদের যতই অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করুক না কেনো, অন্যায় যুদ্ধে ওদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, প্রথমত এ যুদ্ধ দীর্ঘ মেয়াদী রূপ লাভ করেছে যা ইয়াহিয়া চক্র চায়নি। দ্বিতীয়ত হানাদারেরা সবদিক দিয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ চালিযে যাচ্ছে। তৃতীয়ত বাংলাদেশের এই ন্যায় সংগ্রামে বিশ্বের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি, বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ বিশেষ করে রাশিয়া ক্রমেই সোচ্চার ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মানুষের কাছে পাকিস্তান মৃত। কবর খুঁড়ে পাকিস্তানকে পুনরুজ্জীবিত করার শক্তি কারো নেই। ইয়াহিয়া চক্র বাংলাদেশের মানুষের চোখে বিদেশী হানাদার বৈ ত কিছু নয়। তাই ইয়াহিয়ার চক্রকে রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করাই যথেষ্ট নয়। কারণ ইয়াহিয়ার স্বৈরাচারী শাসন জনমতের তোয়াক্কা রাখে না। নিছক পশু শক্তির বলে বাংলাদেশে তারা শোষণ টিকিয়ে রাখতে চায়। কাজেই ইয়াহিয়ার সশস্ত্র বহিনীকে সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত ও ধ্বংস করেই বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে। সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলি কিংবা জনতার কোন অংশের এখনও যদি নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতি কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের ফলে আপোশে স্বাধীনতা লাভের কোনরূপ মোহ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহরে ঐ দুর্বলতা সচেতনভাবে দ্রুত কাটিয়ে উঠতে হবে। কারণ, মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে কোন শর্টকাট রাস্তা নেই। বাইরের কোন শক্তি, সে যেই হোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে না। পাকভারত যুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে না নিয়ে বরং আরো জটিল ও ঘোলাটে করে তুলবে, এ বাস্তব সত্যগুলি উপলব্ধি করে দীর্ঘ ও কঠোর লড়াইয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।'

গ্রীন রোড কলোনি থেকে ধানমণ্ডিতে চলে এসেছি। তিনতলা বাড়ির নিচের তলা, তিন কামরার ফ্ল্যাট। পুবের জানালার পরপারে পাশের বাড়ির লন, ঘাসের নরম চোখ। সকালে যখন রোদ ওঠে রাস্তার ধারের গাছটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। তিনটে বাড়ির পরের ছাদে সৈন্যরা পাহারা দেয়, ঐ বাড়িতে শেখ সাহেবের স্ত্রীকে আটকে রাখা হয়েছে।

কিছুদিন ধরে একটা স্তব ধ্বনিত হচ্ছে হৃদয়ে। এসো প্রাণ, এসো আলো; বিদ্যুতে জ্বলে যাক তিমির, বজ্রপাতে চূর্ণ হোক অন্ধকার; আলো আমার তৃষ্ণা, আলো আমার তৃপ্তি। আমার জন্য লেখা আমার আলো, বজ্র বিদ্যুৎ, আমার তৃপ্তি।

কর্মী দরকার, বিশেষ করে মহিলা কর্মীর, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য। মামুনকে দিয়ে বেবীকে (বেবী মওদুদ) খবর পাঠালাম। বেবী এলেন।

বললাম সবকিছু। বললেন, সাধ্য মতন করবেন। কিন্তু বাড়ি থেকে খুব বেশি বেরোবার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আছে।

কুতুবের সঙ্গে আলাপ হলো নানা প্রসঙ্গ নিয়ে। নরসিংদী-ভৈরব ইউনিটের একটি রিপোর্ট আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। আশুগঞ্জ সাইলোতে হানাদার বাহিনী আড্ডা গেড়েছে। সেখানে আটকে রাখা হয়েছে ৮০/৯০ জন মেয়েকে। অত্যাচার হচ্ছে। কিছু মেয়ের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে, বয়স আনুমানিক ঃ

নাম	বয়স
আফরোজা	১৮
দেলোয়ারা	১৩
নজিবন	২১
কাওছারী	১৭
আসেমা	১৪
আয়েসা	১৭
রাবিয়া	২৭
মাহবুবা	১৫
রহিমা	১৭
রাজিয়া	২৪
অমর্ত্যবিবি	২১
খাতুন	২০
বীণা	১৬
ফিরোজা	১৪
নুরজাহান	২০
শাহানা	১৯
লক্ষ্মী	১৮
ফাতেমা	১৫
রওশন	১২
ফুলচান্দ বানু	১১
লিলি	১৮
হেনা	১৮
গুলজার	২৩
আমিরুতুন্নেসা	২৩
রোকেয়া	২০
মিনু	১৭
ফরিদা	১৩

ফজিলুতেন্নেসা	২৬
মরিয়ম	২০
হরমুতেন্নেসা	১৪
পারুল	১৬
শাহীদা	২৩
মনোয়ারা	২০
বিজয়া	১৭
কুলসুম	২৪
কেয়া	১৬
মুনিরা	২০
ছাবিরা	১৭
হফজা	১৭
লিনা	১৪
মাহফুজা	২৩
ফরহাদ বিবি	২৩
খুরশিদা	২৩
নাসিমা	২০
হামিদা	১৭
মালা	১৭
মিনু	১৬
জায়েদা	১৪
মিলন	২১
রত্না	১৩
হাফিজা	১৮

এসব মেয়েকে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় আটক রাখা হয়েছে। অনেকেই গর্ভবতী।

যাত্রাপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর মেয়েকে ২৫০০ টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। তার মুখ থেকে শোনা ঘটনা। দুজন হানাদার সৈনিক দশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়েকে ছিনিয়ে এনেছে শ্লীলতা হানির জন্য। মেয়েটিকে উলঙ্গ করার পর দেখা গেল যে তার যোনিদ্বার এত ছোট যে তাদের আশা চরিতার্থ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। দুজনই তখন ভাবনায় পড়ল, কি করা যায়। চট করে একজন বুদ্ধি দিল যে যোনিদ্বার কেটে বড় করে নেয়া যেতে পারে। ভাবার সাথে সাথে কাজ। বেয়নেট দ্বারা মেয়েটির যোনিদ্বার কেটে নিল একজন। পর দুজনই তাদের পাশবিক আশা মিটাল। বলা বাহুল্য মেয়েটি বেঁচে নেই। তার লাশ মেঘনায় ভাসিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য বলাৎকার করার পর অসংখ্য মেয়েকে মেরে মেঘনায় ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিশ্বগুদামের একটি ঘরে দশ/বারো জন বন্দীকে এনে দাঁড় করানো হল। কিছুক্ষণ পরেই তারা নাম্নী জনৈকা উলঙ্গ যুবতী মেয়েকে নিয়ে আসা হল। শফী নামক কলেজের জনৈক বন্দী ছাত্রকে উক্ত ঘরেই সকলের সামনে উক্ত যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করতে বাধ্য করা হল। সাথে সাথে উক্ত যুবতী নারীর উপর বলাৎকারের অপরাধে শফির বিচার হল সকলের সামনে। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় শফির প্রাণদণ্ড হল ঃ ঐ ঘরেই একটি পাথরের উপর শফির পুরুষাঙ্গ রেখে অন্য একটি পাথর দ্বারা আঘাত করে তাকে হত্যা করা হল। আর সবচেয়ে করুণ দৃশ্য হল যখন পরপুরুষের সাথে সহবাসের অপরাধে উক্ত যুবতী তারার বিচার প্রহসন হল। তখন তার যোনিদ্বারে আস্ত কচু ঢুকিয়ে দেয়া হল। এবং লোহার রড দিয়ে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হল। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা ধীরে ধীরে আপনাদের জানাব।'

ঠিক করা হল ঐ ইউনিট দালালদের সম্পত্তি বাজেয়াফত ও পুনর্বিতরণের ব্যবস্থা করবে। গেরিলাদের নির্দেশ দেবে সাইলোর ব্যাপারে যথোপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের। আর ঐ খবর বাইরের পৃথিবীতে জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

অফিসে বিদেশী এক ভদ্রলোক এসে হাজির ঃ ইয়ান ম্যাকডোনাল্ড। ঝুনুর সুবাদে পরিচয় দিলেন। বৃটিশ চ্যারিটি কনসোর্টিয়ামের কোঅর্ডিনেটর। বললেন, দরকার মনে হলে যেন যোগাযোগ করি।

বিদেশী সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে খবর পাঠানোর ব্যাপারে যদি সাহায্য পাওয়া যায় মন্দ কি। এসব ভেবেই সিরাজ আর জয়নুল আবেদীনকে টেলিফোন করে বললাম বিকেলে বাসায় আসার জন্য।

বিকেলে জয়নুল আবেদীন, সিরাজ আর মুনিরুজ্জামান এলেন। ইয়ানের কথা জানালাম। জয়নুল আবেদীন মত দিলেন দেখা করা সঙ্গত বলে। সিরাজ যেতে রাজি হলেন না। মুনিরুজ্জামানকে নিয়ে জয়নুল আবেদীন চলে গেলেন ইয়ানের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

মীরা এসেছে বাড়ি থেকে। ধ্বংসের দাগ লাগা চেহারা। জিগগেস করলাম গ্রামের অবস্থা। বলল, আমার মতন। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। প্রথমে এসেই ফরিদাদের পরিবারের সঙ্গে; ফরিদা রাজনৈতিক কর্মী, ফরিদার স্বামী নুরুর রহমান কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত। পরে রীনা মিনুদের সঙ্গে। কাজ করছে, কাগজ বিলি করছে, টাকা তুলছে, কাপড় যোগাড় করছে। কাজ সেরে বাসায় চুপ করে বসে থাকে। কি হয়েছে মীরার ?

জয়নুল আবেদীন চলে গেলেন রশীদকে সঙ্গে করে। আপাতত আগরতলা, পরে কলকাতা। রশীদ চলে যাবেন লন্ডনে, স্ত্রীর কাছে। সিরাজ আর আমার হাতে জয়নুল আবেদীনের হাত; জয়নুল আবেদীন মৃদুস্বরে বললেন, স্বাধীন দেশে দেখা হবে।

ভোর হতেই ঈসা এসে হাজির। রাত্রিবেলা গ্রীন রোডের সেই সাবেক ফ্ল্যাটে আমাকে মিলিটারিরা খোঁজ করেছে। আর জয়নুল আবেদীনের বাসা কর্ডন করেছে।

রাস্তা বন্ধ করে মিলিটারিরা তল্লাশি চালাচ্ছে। ভেতর থেকে কেউ হয়তো খবর দিয়েছে। কিন্তু কে হতে পারে, কে ? সময় নেই অত ভাববার; চেক লিখে মুন্নীকে দিলাম; বিটুর চুলে বিলি কাটলাম, কাগজে পাজামা আর টুথব্রাশ আর সেভিংসেট পেঁচিয়ে বেরিয়ে এলাম। রোদে ঝকঝক করছে দিন।

আজুদের বাসা। মীরা দুদিনের জন্য ফরিদাদের বাসায় গেছে, বলে পাঠিয়েছে ঢাকার বাইরে যাবে।

দু'দিন দু'রাত ঘরের মধ্যে। আজু কাজে গেলে একটু লিখি, বই পড়ি, ভাবি, কিংবা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি। দূরে গাছগাছালি, পাখি, প্লেন, রান্নাঘরে গরম মশলার গন্ধ, মাথার মধ্যে ভাবনা। আজু এলে কথা বলি, মেতে উঠি স্বপ্ন নিয়ে। স্বপ্নের জন্য আমরা প্রস্তুত। স্বপ্নের দেশের আমরা অধিবাসী। আজু তাকিয়ে তাকিয়ে শোনে, আর আমি কথা বলি, মিশে যায় তার মধ্যে পৃথক পৃথক সকল মানুষের মনের ভাব।

দু'দিন দু'রাত পর বাসায় ফিরেছি। মিলিটারি আর খোঁজ করেনি। ফের কাজ, কাজ, কাজ। মতি জানিয়েছেন তাঁরও হয়তো চলে যেতে হবে, পেছনে ফেউ লেগেছে। বাছাই করার সময় এসেছে। চলে যাওয়া কিংবা থাকার সকল ঝুঁকি নেয়া। কেন জানি দেশ ছেড়ে যেতে মন চায় না। একটা গোটা নতুন দেশ মানুষদের কবে আমরা উপহার দেব ?

ইডেন কলেজ হোস্টেলে দুটি মেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে; মীরাকে বলেছি খোঁজ করার জন্য। বহুদিন পর একা লাগছে, ক্লান্ত আর অবসন্ন।

সকালে এসে দেখি অসুস্থ, মীরা বিছানায় শুয়ে। অফিস যাওয়ার পথে আজুদের এখানে। কিছু কাগজ বিলি করার কথা ছিল আজুর সে-খবর জানা দরকার, আরো জানা দরকার ইডেন কলেজ হোস্টেলে দুটি মেয়ে আশ্রয় নিয়েছে, মিলিটারি তাদের সম্মান বিনষ্ট করেছে, মীরা কি সে-খবর বের করতে পেরেছে। আজু জানাল বিলি সম্ভব হয়নি; মীরা জানাল দারোয়ান ভেতরে ঢুকতে দেয়নি।

হঠাৎ দেখি মীরা কাঁদছে, নদী যেন নিশান তুলছে তেম্নি চোখ, কান্নার পর বিদ্যুতের মত। ভাবলাম কি অসুখ মীরার ? জবাব দিল না, হাসল বরং, বলল, দুপুরে ফের আসবেন, কথা আছে। আমার তাড়া ছিল, চলে গিয়েছি; আমার কাজ ছিল দুপুরে আসিনি।

সারাটা দিন কাজ থেকে কাজে ঘুরে বেরিয়েছি ঃ কাগজ বিলি করা, টাকা তোলা, ওষুধ সংগ্রহ করা। বেলা এগারোটা নাগাদ মতিঝিলের কোন এক অফিস থেকে এক ভদ্রলোককে সেনাবাহিনীর লোকজন ধরে নিয়ে গেছে। খবর পেয়ে তাঁর স্ত্রী এসেছেন, আর কান্না; সারা দেশে কান্না জমছে। বেলা তিনটা নাগাদ কাকরাইলের মোড়ে রিকশা থেকে এক মহিলাকে জোর করে তিন পাঞ্জাবী সৈন্য জীপে তুলে নিয়ে গেছে। মহিলার চার বছরের ছেলে রিকশায় কাঁদছে; সারা দেশে বাচ্চারা কাঁদছে। বেলা পাঁচটা নাগাদ শাহবাগ এভিন্যুর জনৈক দোকানীর লাশ দুটি পাকিস্তানী সেনা রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়েছে;

সারা দেশে লাশ জমছে। আমাদের কাগজে ঐ সবের প্রতিবাদ, বিদ্রোহের ডাক, হাতে হাতে বিদ্রোহ বিতরণ করি, কসম খেয়ে বলি ঃ এ দেশ আমার।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে মীরার কথা মনে হয়েছে। প্রতিরোধের কাজ সময় গিলে নিয়েছে। আরো একজনকে কাগজ দেয়া দরকার, আরো কিছু ওষুধ দরকার, আরো কিছু টাকা দরকার; অমন সব দরকারের ফাঁকে ফাঁকে মীরার চোখ উঁকি দিয়েছে, নদীর নিশান আঁকা; তারপরই বিভিন্ন কাজ আড়াল করে দিয়েছে নদীর নিশান, কাজের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছি সরোষে দুর্ভেদ্য ঢাকা শহরের দিকে, ঢাকাকে জয় করে নিতেই হবে, অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে আমাদের ভয়ঙ্কর দিন আর রাত্রে।

ভয়ঙ্কর দিনের শেষে ভয়ঙ্কর রাত এসেছে। আজ চাঁদ নেই, বাতাসও নেই, অন্ধকার; মধ্যে মধ্যে নেকড়ের পালের মতন মিলিটারি গাড়ির চিৎকার উঠছে; ঐ অন্ধকারের মধ্যে আমি লাশ রোপন করছি, লাশে পানি দিচ্ছি। লাশকে বেড়ে উঠতে দেখছি। এই হচ্ছে বাংলার ফসল ঃ মানুষ-ফুল; প্রতিটি কুঁড়িতে ভালবাসা, সূর্য বিহনেও আলোর উন্মীলন ; ঐ ফুল সারা দেশই শুদ্ধ করে দিচ্ছে, আর যাতে কখনো নোংরা না হয়। কিন্তু ঢাকার রাস্তায় এখন ক্লান্তি আর বিনাশ আর খিদে আর আতঙ্ক; এর মধ্যে দিয়ে আমাদের যাত্রা, যদি ও জানা যে-কোন মুহূর্তে আমরা মরে যেতেও পারি। সেজন্য হয়তো কাজের ওপর তাড়া; আতঙ্ক কি মানুষকে বীর করে তোলে ?

আর ঘরের আসবাবপত্র স্মৃতি জাগায় ঃ পা টিপে টিপে আমি পল্লবীর বাড়িতে ঢুকি। টেবিলে দোয়াতদান, পত্রিকা আর বই। ওয়ার্ডরোবে শার্ট, কোট, প্যান্ট আর তোয়ালে। খাবার ঘরের আলমারিতে জাপানী চায়ের পেয়ালা, পেশোয়ার পটারীর কফির পাত্র। দেরাজ খুলি ঃ বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য, শৃঙ্খলা; টেবিল ক্লথ শাদা ফুলের চেয়েও শুভ্র। কেন আমি সবকিছু দেখতে চাই, খুলতে চাই ? ঐ সব থেকে আমি বিতাড়িত, দূরে; ফের ফিরে যেতে চাই নিজের বাড়িতে, স্বদেশে; স্মৃতিই কি স্বদেশ এখন ?

ভোরে প্রথমে কাজ মীরাকে দেখতে আসা। আজুদের বাড়ি আশ্চর্য চুপ। ভেতরে ঢুকেই জিগগেস করলাম ঃ মীরা কেমন ?

আজু দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, মীরা নেই।

ধরে নিয়ে গেছে ?

না।

কি হয়েছে বল ?

মারা গেছে।

কখন ?

গতকাল দুপুরে। তোমাকে দেখতে চেয়েছিল। রাত্রেই দাফন হয়েছে। পাড়ার লোকজন ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

তারপর আজুর কান্না প্রবল ঢেউয়ের মতন।

মীরা, আমাদের সহকর্মী, এই দুঃসময়ে জীবনের পরপারে। খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া বাঁধা অস্তিত্ব, মৃত্যু এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য নয় তবু বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক মৃত্যু আমরা ভুলেই গেছি, রোজই কেউ-না-কেউ মারা যাচ্ছে গুলী খেয়ে, বেয়নেটে বিদ্ধ হয়ে, সেখানে কেউ সামান্য অসুখে মারা যেতে পারে এ যেন বিশ্বাসের অতীত। মীরা, আমাদের সহকর্মী, আজ কবরে শুয়ে; কবর আজ তার শিরস্ত্রান।

সবে বাড়ি থেকে এসেছে আর সর্বক্ষণ কাজ নিয়ে মীরা ছুটোছুটি করেছে; পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে; তুলেছে টাকা, কাপড়; ছোট ভাইটি মুক্তিফৌজে গেছে, খবর পেয়েছে কুমিল্লার কাছে আছে, বন্ধু রীনাকে সঙ্গে করে সেখানে গেছে যদি দেখা হয়।

আজুকে জিগগেস করছি ঃ কি হয়েছে মীরার ? আজু জবাব দিয়েছে, এবারে ফেরার পর মীরা অমনই করে। কথা বলে না চুপ করে থাকে। মীরাকে জিগগেস করেছি ঃ কি অত ভাব ? মীরা হেসেছে, হাসি অত পবিত্র কখনো আগে মনে হয়নি।

ঘরের মধ্যে আজু কাঁদছে, বারান্দায় আমি, বাইরে বৃষ্টি আর আকাশে পাগলা মেঘ, থেকে থেকে বিদ্যুতে ফেটে যাচ্ছে আকাশ। আজু কেঁদো না, বারে বারে ঘুরে ঘুরে মনে ঐ একই কথা; তবে আজু কেঁদে চলেছে, কখনো রোদন কখনো বিলাপ, যেন নিরবধি কান্না।

আজু, আমি চলি; আজু স্তব্ধ, সমস্ত শরীর তার কান্না শুষে নিচ্ছে; নিশানের মতন চোখ তুলে আজু তাকিয়েছে আর বলেছে ঃ মীরা অন্তসত্তা ছিল। জন্তুরা বাড়িতে ওর ওপর অত্যাচার করেছে। আজু ফের চুপ, সত্য সভ্যতা পরাজিত করেছে, শব্দ হরণ করেছে সব শোভনতা।

মীরা আমার সহকর্মী লুণ্ঠিতা আমার দেশ। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, যতদিন আমার লেখা বেঁচে থাকবে, ততদিন উদ্যত থাকবে আমার অভিশাপ ঃ জাহান্নামে তোমাদের স্থান। বাইরে বৃষ্টি, মীরার চোখের মশাল জ্বলছে, অনির্বাণ, শাদা শিখা জ্বলছে পুড়ে যাচ্ছে পাপ আর অসম্মান। মীরা আমরা পরাজিত হবো না, মীরা আমরা বেঁচে থাকব, মীরা আমরা প্রতিষ্ঠা করব ঃ স্বাধীনতা।

১৭

হঠাৎ করে ইয়ান অফিসে। কাগজ টেনে দ্রুত লিখলেন। বললেন, আগামীকাল রেঙ্গুন যাচ্ছি। বর্মায় বাঙ্গালী কত আশ্রয় নিয়েছে তার সঠিক তথ্য জানবার জন্য।

কাগজটা বাড়িয়ে বললেন, দেখা হবে।

কাগজে লেখা ঃ মার্টিন উলাকট, গার্ডিয়ানের করেসপন্ডেন্ট, ঢাকায় এসেছেন। উঠেছেন ইন্টারকনে। দিন সাতেক থাকবেন। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগে উৎসুক। উলাকটের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হয়। কিন্তু বিপদের ঝুঁকি কম নয়। ইন্টারকনের

রিসেপশন ডেস্কে বসানো হয়েছে ইসলামী ছাত্র সংঘের দুই সদস্যকে। তাদের দায়িত্ব বাঙ্গালী কেউ এলে চোরাক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা; তাদের সঙ্গে কথা না বলে কারো ওপরে যাওয়াও বারণ। কে যাবে ? কাকে পাঠাতে পারি ? বাইরের পৃথিবীতে কতগুলি খবর জানানো জরুরি হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে জানানো দরকার ঢাকা শহরের হত্যাকাণ্ডের সঠিক তথ্যাবলী। ডকুমেন্ট আমরা তৈরি করেছি, মুনিরুজ্জামান তৈরি করেছেন।

দিনটা সুন্দর। রোদ তার সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। উন্মীলিত উজ্জ্বল নাকি বিকীর্ণ জ্যোতি; রোদের গভীরে ধ্বনিত বাঁশী, শোনা যাচ্ছে; আমার রক্তে রোদ, হৃদয়ে রোদ, চোখে উতরোল রোদ, আমার শরীর থেকে নিশ্বসিত হচ্ছে রোদের সুগন্ধ।

সানাউল হক খবর পাঠিয়েছেন। আমার অফিসের পিছনে তাঁর অফিস, হাবিব ব্যাংক ভবনে। চায়ের কথা বলে নিবিড় হয়ে বসলেন তিনি, জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি খবর ? বললাম, এখনো টিকে আছি। তিনি ফের ঃ বেঁচে আছি নরকে। ফরেন সার্ভিসের লোকজন আছে ভালো, পটাপট ডিফেক্ট করছে। আর আমরা ? দেশের মধ্যে থেকে কোথায় ডিফেক্ট করবো। আমি কিছু বললাম না। স্বগতোক্তির মতন তিনি ফের লিখছেন কেমন ? আমি কিন্তু পারছি না। চেষ্টা করছি ছড়া, গদ্যজাতীয় লিখতে। আসলে লেখাটা বেঁচে থাকারই চেষ্টা। বাসায় যাই, ভাবি রাত পোহাবে তো। আর রাত হলেই নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরে। ভয় জাগে। আমার এক বোন বিধবা হয়েছেন। স্বামীকে মেরে ফেলেছে পাকিস্তানীরা। আর আমার এমন নসীব পাকিস্তানীদের চাকরি করে যাচ্ছি। এই যন্ত্রণার শেষ নেই। দেশ কোনদিন স্বাধীন হবে। তখন কি এই যন্ত্রণার দাম দেবে কেউ, এই নরকবাসের, অভিজ্ঞতার এই উৎকণ্ঠার ? যাঁরা চলে গেছেন তাঁরা শরনার্থী, আমরা যাঁরা থেকে গেছি আমরা মরনার্থী। আসলে লিখুন, সবাইকে বলুন লিখতে। লেখাটাই নিশ্চিত অস্ত্র। আপনাকে কেন খবর দিয়েছি জানেন ? পাকিস্তান সরকার আমাকে এক কোটি টাকা দিয়েছে পাট কেনার জন্য। ঐ টাকাটা চাষীদের পর্যায়ে বিলি হোক আমি চাই। গ্রামের লোক খেতে পাচ্ছে না। পাট যখন ফড়িয়ারা কিনবে কিংবা গুদামজাত হবে তখন নষ্ট করে দিন। এমন করলেই পাট দেশের বাইরে যেতে পারবে না। চাষীদের ওপর চাপ না দিয়ে ঠাণ্ডা করুন ফড়িয়াদের। কর্তৃপক্ষকে সমস্যাটা বোঝানো দরকার। কি মনে হয় আপনার ?

বললাম, যথাস্থানে খবর পৌঁছে দেব।

দুপুরের রাস্তা লোক বিরল। মধ্য দুপুরের শহর জুড়ে একটা স্তব্ধতা তৈরি হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে সৈনিকদের একটা জীপ ছুটে যাচ্ছে, হত্যা ছড়িয়ে ছড়িয়ে। আমার মন বলছে ঃ বিদ্রোহ, উচ্চারণটা এলএমজির মতন হাতের মুঠোয়, নলের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্মৃতি আর স্বপ্ন।

এসে দেখি মতি বসে আছেন। কি ব্যাপার ?

বললেন, একটা গাড়ি দরকার। অস্ত্র সরাতে হবে।

বললাম, ব্যবস্থা হবে।
কবে ?
কাল।
মতি চলে গেলেন। তাঁর ঠোঁটে সেই প্রিয় হাসিটি।
অফিস থেকে বেরোবার মুখে অনুর (আনোয়ারুল ইসলাম) সঙ্গে দেখা।
অনু বললেন, ডাক্তার (মুনিরুজ্জামান) একটা গোপন পত্রিকা বিলি করছে।
পড়বেন ?
বললাম, কি ?
অনু ফের বললেন, স্বাধীনতা।
বললাম, দেবেন।
ভালো লাগল, সংগঠনটা দানা বাঁধছে। প্রতিরোধের মূল শর্ত ঃ গোপনীয়তা, তাই মেনে কাজ চলছে।
নাহারের বাসা। বললেন, আপনাকে ভাই টেলিফোন করেছিলাম একটা কাজে।
জানালার ওপাশে আজিমপুর কলোনি, দোতলার ফ্ল্যাটের চিলতে বারান্দায় এক মহিলা দাঁড়িয়ে, চোখ সিধা নাহারদের দোতলায়।
বললাম, বলুন।
নাহার একটু থেমে বললেন, ওদেরকে ব্যাংকে কাগজ দিতে মানা করবেন। এবার থেকে বাসায় পৌঁছে দিতে বলবেন। বিহারী দারোয়ানটা সন্দেহ করছে। কাগজটা পড়ে সবাই কিন্তু ভরসা পাচ্ছে।
বললাম, বাসায় যাতে পান সেই ব্যবস্থাই করা হবে।
কুতুবের ওখানে। কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেয়া হল। যে-সব যায়গায় আমাদের ইউনিট আছে সেখানে জমি পুনর্বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জমিই চাষীদের কাছে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র। জমিকে রক্ষা করার জন্যই চাষীরা যুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠবে। দেশপ্রেমে উদ্দীপিত হবে। রাজনীতি ও অধিকার সচেতন হবে। জমি কেড়ে নিতে হবে দালাল, জোতদার, শান্তি কমিটির সদস্য, মুসলীম লীগ জামাতের টাউটদের কাছ থেকে। প্রায় ক্ষেত্রে যারা দালাল তারাই ফের জোতদার, শান্তি কমিটির সদস্য, মুসলীম লীগ জামাতের টাউট। দেশের মধ্যে মুক্তাঞ্চল গঠনের প্রাথমিক শর্ত ঐ সব।
মুনিরুজ্জামানের সঙ্গে কথা হল উলাকটের প্রসঙ্গে। বললেন, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি নজরুলকে নিয়ে আসব।
জিগগেস করলাম, কোন নজরুল ?
বললেন, নজরুল, ভূগোলের, আমাদের লোক।
বললাম, সময় কম। কালকেই নিয়ে আসবেন।
গিয়াস এল, সঙ্গে চিনি ও চালের বস্তা। কি ব্যাপার ? গিয়াস হেসে বলল, সুফিয়া কামাল দিয়েছেন। ওঁর ওখান থেকে ছেলেরা এসে আগে নিয়ে যেত। কিছুদিন ধরে কেউ আসছে না। আমাকে বললেন, তাই নিয়ে এলাম।

কফি খেতে খেতে গিয়াস আরো বলল, দুলাভাই (আবদুল মোমেন) একটা চিঠি পেয়েছেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সেক্টর কমান্ডারের চিঠি, স্বাক্ষর অস্পষ্ট। অপরাধ ঃ দেশদ্রোহীতা, তবে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিলে অব্যাহতি দেয়া হবে। কারা অমন করছে আঁচ করতে পারো ? দুলাভাই অবশ্য বলতে মানা করেছেন।

গিয়াসের কথা ভাবিয়ে তুলেছে। কুতুব বলছিলেন সম্প্রতি এই উৎপাত শুরু হয়েছে। এরা কারা ? স্বাধীনতার নাম করে টাকা আদায়কারী এরা কারা ?

গিয়াসকে বললাম, দুলাভাইকে বলো টাকা না দেয়ার জন্য। ব্যাপারটা আমরা তদন্ত করছি। দুতিন দিন সময় দাও।

রাত্রে থেকে থেকে মনে পড়ছে আজু আর মীরাকে। মীরার শখ ছিল বিয়ের ফটোগ্রাফ যোগাড় করার। হায়রে, দুঃসময়ের ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখন, ঝাপটের পর ঝাপট তুলে। আমরা যারা বেঁচে, সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে স্মৃতির ভার, স্মৃতি তো নয় বিরাট গভীর ক্ষত মনের মধ্যে, কিছুতেই আর জোড়া লাগার নয়। যুদ্ধ শেষে সবাই হয়তো নিজের নিজের কাজে, সংসারে, অভ্যাসে ফিরে যাবে; শুধু আমি হয়তো পারব না, আমাকে ছত্রখান করে দিয়েছে এই সময়, শুধু মাত্র বিষণ্ন গান ধ্বনিত হবে, অনুভব করব দিগন্ত জোড়া বিশাল বিদায় ঃ থেকে থেকে উঁকি দেবে আমার সহকর্মীরা, সহযোদ্ধারা, আমি লুপ্ত তাদের মধ্যে।

সকাল, রেকর্ডে বিসমিল্লা খানের শানাই শুনছি রাগ মালকোষ। চোখ বুলাচ্ছি আঁদ্রে জীদের জার্নালে। গেরিলার মুখের মতন রোদ ঘিরে ধরছে শহর, হাওয়া ছড়িয়ে দিচ্ছে পাতা ঝরার স্তব্ধতা। ইচ্ছে করছে পায়ের তলায় ঘাসের শান্তি মাখতে, ইচ্ছে করছে শরীরে রোদ ভর্তি করতে। আমার বুকের মধ্যে মুক্তাঞ্চল প্রসারিত হচ্ছে, আমি দেখছি সরল রেখায়, বৃত্তে, বিন্দুতে ভীষণ সমারোহে পা ছড়িয়ে বসে আছে আমার দেশ।

কুতুবের ওখানে। গেরিলা ও কমান্ডো কর্মপদ্ধতির পার্থক্য নিয়ে আলোচনা হল। আসলে যা হচ্ছে সবই কমান্ডো কর্ম পদ্ধতি, দরকার গেরিলা কর্ম পদ্ধতির। গেরিলা কর্ম পদ্ধতির শর্ত মুক্তাঞ্চল, দেশের অভ্যন্তরে। জনগণের মধ্যে থাকে গেরিলারা, জনগণের মুক্তাঞ্চল, দেশের অভ্যন্তরে। জনগণের মধ্যে থাকে গেরিলারা, জনগণের সন্তান তারা, এই সঙ্গে সশস্ত্র রাজনৈতিক কর্মী। আমাদের ইউনিটগুলোকে এভাবে ঢেলে সাজানো জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্য সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমাজ বিরোধীরাও অংশ নিচ্ছে। তার প্রমাণ গিয়াসের দুলাভাইয়ের চিঠি প্রাপ্তি। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর হামলার ফলে সমাজ বিরোধীরাও দেশের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তাদের এক অংশ রাজনৈতিক দলের নেতাদের উৎসাহ ও সমর্থন পেয়ে মুক্তি বহিনীতে অংশ গ্রহণ করেছে। রাজনীতির সঙ্গে সমাজ বিরোধীদের ঐ যোগাযাগের পরিণতি হিসাবে সমাজবিরোধীরাও কমান্ডো কর্ম পদ্ধতির পিছনে এসে জমায়েত হয়েছে। রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের শিক্ষিত করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হয়নি। কিছু চেষ্টা হয়েছে, সত্য। অন্য অর্থে ঐ সমাজ বিরোধীরা রাজনীতি সচেতন আগেই ছিল, কারণ তারা ছিল দলের পিটুনী অংশ। তবে আদর্শের কোন প্রভাব তাদের উপর ছিল না। সেজন্য হয় তো চরিত্রগত ভাবেই ঐ সব কমান্ডোরা দেশ শত্রু শ্রেণীশত্রু খতম করার চেয়ে তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে টাকা আদায় করাটাই লাভজনক মনে করেছে। যুদ্ধ শেষে খুব সম্ভব সমাজ বিরোধীরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে ঐ সব কারণে। সমাজ বিরোধীরা যুদ্ধের জন্যই জনগণের মধ্যে আশ্রয় পাচ্ছে এবং আশ্রয়দাতাদের বোঝাতে পারছে তারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। রাজনৈতিক দল ও সমাজ বিরোধীদের মৈত্রী জোট ভাঙ্গা নির্ভর করছে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ মুক্তাঞ্চল প্রসারণের ওপর। তা না হলে ভবিষ্যতের রাজনীতিতে সমাজবিরোধীদের সন্ত্রাস ছায়া ফেলবেই, রাজনীতিতে সামাজিক দায়িত্বহীনতা দেখা দেবেই, স্বাধীনতার সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হবেই। ধন বৈষম্য, উৎপাদনহীনতা, কালো টাকা, শিক্ষায় অরাজকতা, বেকার মানুষদের প্রচণ্ড চাপ এসব নিয়েই দেশ স্বাধীন হবে। সেজন্যই গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও মুক্তাঞ্চল জরুরি হয়ে পড়েছে।

মতিন ভাই মরহুম শরাফত আলীর ভাই শহীদুল্লাহর জন্য ট্যুশানির বন্দোবস্ত করেছেন। গিয়াসকে খবর পাঠাতে হবে শহীদুল্লাহকে বলবার জন্য।

দুপুরে আজুদের ওখানে খেতে গিয়েছি। এক ভদ্রলোক বসে ঃ শাহরিয়ার ইকবাল, তাঁর স্ত্রী খাদিজা ইকবাল। ইকবাল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, খাদিজা অধ্যাপিকা।

ইকবাল বললেন, আপনার কথা শুনেছি। একটা ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে হবে।

বললাম, বলুন।

ইকবাল বললেন, মিলিটারীরা যাদের ধরে নিয়ে যায় তাদের বিচারের জন্য জবানবন্দি নেয়। দরকার তাই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের। আমাকে এর আগেও কয়েকবার যেতে হয়েছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ওঠেই নাই। কিন্তু আমি কি করতে পারি বলুন ? মুক্তি বাহিনীর যোদ্ধারা তো ভুল বুঝবে না, ভাববে না তো আমি দালাল, সহযোগিতা করছি।

বললাম, বিনিময়ে একটা ব্যাপারে সাহায্য চাই। য়ুনিভার্সিটির শিক্ষকদের খবর চাই।

ইকবাল বললেন, আমি ওঁদের জবানবন্দি নিইনি। শুনেছি ওঁরা এখনো ভালো আছেন, টর্চার এখনো করেনি। ওঁদের খবর আমি আপনাকে দেব। আরো যাঁদের খবর চান তাঁদেরও।

বললাম, আপনি নিশ্চিত থাকুন।

খাদিজা বললেন, ভরে বিশ্বাস করুন রাত্রে ঘুম হয় না। আপনি আমাকে শান্তি দিলেন।

জানালার ওপারে একটা লাল পাখি উড়ে যাচ্ছে। উত্তোলিত বর্শার মতন রোদে গেঁথে যাচ্ছে গাছের শরীর। গাছের পাতা নাগরদোলার মতন হাওয়া খুঁজছে, আকাশ খুঁজছে কিংবা খুঁজছে আমাদের হৃদয়ের শেষতম প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা কিংবা সুখের মতন সুখ, দুঃখের মতন দুঃখ। আজ তুমি কি জানো রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর মানুষের স্বাধীনতা সমান করার জন্যই যুদ্ধ করছি; জানো আমার প্রতিটি শব্দে জেগে থাকে ভোরের উষ্ণতা, বেঁচে থাকা নামক আকাঙ্খা; জানো মিল-অমিলের সিঁড়ি বেয়ে আমরা যাচ্ছি মানুষের কাছে।

বিকেলে মুনিরুজ্জামানের সঙ্গে নজরুল এলেন। আমার পূর্ব পরিচিত। সব বললাম, বিপদের ঝুঁকি শুদ্ধ।

নজরুল বললেন, সব জেনেই এসেছি।

বললাম, ডকুমেন্টটা দেবেন। যা জিগগেস করে জবাব দেবেন। সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। বান্ধবী যদি থাকে সঙ্গে নেবেন। টেলিফোন করার দরকার নেই। উলাকট সব জানেন। আর আমাকে পারে খবর দেবেন।

পরদিন বিকেল। নজরুল এলেন, বললেন, কোন অসুবিধা হয়নি। উলাকট পরিস্থিতি সম্বন্ধে নানা কথা জিগগেস করেছে। বলেছি। আর মুক্তাঞ্চলে যেতে চেয়েছেন।

বললাম, আপনি দিন সাতেকের জন্য উধাও হয়ে যান। মিলিটারি কিছুতে যেন খোঁজ না করতে পারে। উলাকটের মুক্তাঞ্চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।

কুতুবের সঙ্গে কথা বলে উলাকটকে মুক্তাঞ্চলে নেয়া হল। ফিরে এসেই উলাকট লন্ডন চলে গেলেন।

বিবিসিতে উলাকটের রিপোর্ট প্রচার হল। এই প্রথম বাইরের পৃথিবী জানল বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই মুক্তাঞ্চল আছে, দীপ্তমুখে তাকিয়ে আছে।

আকাশটা আজ আলো আর হাওয়া আর মেঘ, মনে হচ্ছে আকাশটা শুচি করে দিচ্ছে আমাদের দিন আর রাত।

১৮

বিটুর জ্বর, একশো চার; মুন্নী সামলাতে পারছে না। দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে রাখে। সকালবেলা গিয়ে মামীকে নিয়ে এলাম। অফিসে মন খারাপ লাগছে। থেকে থেকে জাগছে বিটু, থেকে থেকে জাগছে ঢাকা শহর, পরস্পর প্রবিষ্ট; অসুখে নষ্ট হচ্ছে বিটু, নষ্ট হচ্ছে দেশ। রাতজাগা ক্লান্তি চোখে, ঘুম ডাক দিচ্ছে।

বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মামার টেলিফোন ঃ এখুনি চলে এসো। ধক করে উঠলা বুক বিটুর কিছু হয়নি তো। মামা জানালেন বাসা কর্ডন করে তল্লাশি চালাচ্ছে। খবর জেনে বাসায় যেন যাই।

বাসায় বিটু আর মুন্নী আর মামুন আর দুই গৃহভৃত্য। মামুনকে তো ধরে নিয়ে যায়নি ছাত্র বলে ? কিংবা আমাকে তো খোঁজ করেনি গোপন খবর পেয়ে।

বিটুর জ্বর, বাসা তল্লাশি হচ্ছে ; পরস্পর বিরোধী, হয় তো এই সময়ে এটাই স্বাভাবিক, সঙ্গত। বিটুর জ্বর কমেছে কি; কে জানে। এই সব ভেবে ভেবে চারটা নাগাদ বাসার দিকে রওয়ানা হয়েছি। লেক পেরোবার পরেই গাড়ি থামিয়েছে আলবদর আর রাজাকাররা। আইডেনটিটি কার্ড দেখছে, বনেট খুলে দেখছে।

বাসার এসে দেখি মামী সন্ত্রস্ত; বিটুর কপালে আইসব্যাগ ধরে বসে আছেন। আর কারো সাড়া নেই। জিগগেস করলাম, মুন্নী কই, মামুন কই ?

মামী কয়েক লহমা চুপ থাকলেন; পরে বললেন, মুন্নী গেছে মামুনকে পৌঁছে দিতে লিলির বাসায়।

মামী বললেন হঠাৎ এসে মিলিটারি সারা বাড়ি কর্ডন করে। ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট সার্চ শুরু করে। কোন ফ্ল্যাটেই পুরুষ মানুষ নেই। তারা খোঁজ করছে চশমা পড়া এক ছেলেকে। মামুন পিছনের ঘরে, উঁকি দিয়ে দেখে, পরে টেনে তোলে পাড়িতে। পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেটিকেও। মামুন হতভম্ব; পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা কাঁদছেন। মুন্নীর কাছে এসে তোমার নাম জিগগেস করছে, ফটোগ্রাফ দেখতে চেয়েছে, ফটোগ্রাফ নিয়ে আলাপ করেছে। বিটু জ্বর গায়ে বারান্দায় এসে গেছে। হঠাৎ আমি রাস্তায় গিয়ে উর্দুতে বলা শুরু করলাম, মামুনকে কেন নিয়ে যাচ্ছে, যাকে তোমরা খোঁজ করছ তার সঙ্গে কি মামুনের মিল আছে এইসব। আমার জুনাগড়ী চেহারা আর উর্দু শুনে ওরা মামুনকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেটিকে নিয়ে গেছে। ছেলেটির মামাতো ভাই গবর্ণরের সেক্রেটারি, ভদ্রলোক গিয়ে ছেলেটিকে ছাড়িয়ে এনেছেন। মামুন খুব ভয় পেয়েছে, এখানে থাকতে চাচ্ছে না। সেজন্য মুন্নী নিয়ে গেছে লিলির বাসায়।

লিলির ওখানে এসে দেখি বড়োভাই এসেছেন চট্টগ্রাম থেকে। বড়ো ভাইকে বললাম মামুনকে চট্টগ্রাম নিয়ে যেতে। কখন কি হয় কে জানে। আমরা তো ভয়ের মধ্যে জীবনাপন করছি, সেখানে হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয় বিশ্বাসের আর আশার উন্মাদনা। তুমুল ঘটনাবলীর চাপে ধ্বংস হচ্ছে সংসার, সম্পর্ক; ধ্বংস হচ্ছে আমাদের অনেক কিছু। ভাইপোদের মধ্যে মামুন আমার সংলগ্ন; অনেকদিন বেঁচে থেকেছি; এখন সর্বক্ষণ চিন্তা ওরা বেঁচে থাক। কিছুদিন ধরে হতাশার অভিশাপ লেগেছে। আশা দাও, আশা দাও; দিগন্তে অন্ধকারে, চতুর্দিকে ক্লান্তি, নিঃসৃত হচ্ছে হতাশা, ঝোঁকে ঝোঁকে; ভয় হচ্ছে নরকের বাসিন্দা হতে চলেছি।

আশুগঞ্জ ইউনিটের রিপোর্ট ; আমি আর কুতুব পড়ছি। আশুগঞ্জ বাজারে কোন মানুষ নেই বললেই হয়। সরকার পক্ষ অনেক চেষ্টা করেও বাজার বসাতে পারেনি। আশুগঞ্জ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পর্যন্ত রেললাইনের পাড়ে পাড়ে যতগুলি বাড়ি ছিল সব পুড়েছে। অবশ্য এখন কোন চিহ্নই দেখতে পাবেন না। কেননা সবাইকে টিন দ্বারা বাড়ি পুনঃনির্মাণ করতে বাধ্য করেছে। জমি বিক্রয় করে মানুষ নতুন টিন দ্বারা বাড়ি

করছে। যাদের বিক্রির মতো জমি নেই তারা পালিয়ে বেঁচেছে। অবশ্য জমি কেনে কে! হাজার টাকার জমি একশত টাকায় বিক্রয় হয়েছে। মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা নাইবা বললাম। জমি ভরা ধান, কিন্তু ঘরে আনে কে ? যুদ্ধ চলছে মুখোমুখি, পালিয়ে পালিয়ে। জনতার সাথে যোগাযোগ ? নেই বললেই চলে। বড় শরিকেরা যা-তা ব্যবহার করে। সংগঠন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারছি কই। আমাদের কয়েকটা গ্রুপ আছে। কিন্তু পরিকল্পনা মোতাবেক কিছুই হচ্ছে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, কার জন্য সংগ্রাম ? জনতার জন্য ? আমরা তো জনতার বিপদের মাত্রা কমাতে পারছি না। বরং বাড়াতেই পারছি। আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব। বড় অভাবে আছি। কিছু পয়সা, ওষধ, কাপড় দরকার। কাপড়ের মধ্যে লুঙ্গি, গামছা, সার্ট ও গরম হলে ভালো। নগদ পয়সা মোটেই নেই। পাব কোথায় ? জনতার হাতে পয়সা থাকলে তো আমাদের হাতে থাকবে। যাক এবারে কয়েকটি গ্রামের তথ্য দেব। পরে আরো পাঠাব।

ইউনিয়ন	গ্রামের নাম	পূর্বের লোকসংখ্যা	বর্তমান	মৃতেরসংখ্যা
আশুগঞ্জ	চারতলা	২৩০০	৭০০	৫০
	যাত্রাপুর	১৮০০	১৩০০	৫৪
	আড়াইসিধা	৩০০০	২০০০	৮৫
	তল্লা	১৫০০	১১০০	৭৪
	সোনারামপুর	৮০০	৬০০	১২
ভাদুরপুর	সোহাগপুর	২৯০০	১২০০	১৪০
	ভাদুরপুর	১৫০০	১২০০	৩০০
	খয়রালা	২৫০০ (বিমানহামলা)	১৫০০	২৫০
	শতঘরহাটি	১২০০	৮০০	৩২
তালশহর	খারাসার	১০০০	৭০০	২৫
	তালশহর	২৬০০	১৭০০	৬৭
	নাউঘাট	২৩০০	১৮০০	৫
	ছোট অরন	৬০০	৩০০	১১

সংখ্যাগুলি প্রায় সবই আনুমানিক। আমাদের পক্ষে যা জানানোর তা অবশ্যই পাবেন। প্রয়োজনীয় বক্তব্য, জিনিসপত্র সব শহীদুল্লাহ্‌র সাথে দিয়ে দেবেন।

ঠিক হল কুতুব ঐ এলাকায় আগমীকাল রওয়ানা হয়ে যাবেন। এ ইউনিটকে সংগঠিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। রিপোর্টে ধ্বনিত হতাশা, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক। মানুষ হয়তো একটানা আশাবাদী থাকতে পারে না। মধ্যে মধ্যে হতাশার শিহরণ জাগে। তখন দুঃখ মূল্যবান মনে হয়। মানবিকতার উপাদান সব মিলিয়ে ঃ আশা হতাশা, দুঃখ কিংবা সুখ; হৃদয়ের রাজনীতিতে কোন উপকরণ অব্যাহত নয়

চিরকাল। আমরা সবাই আশার জন্য প্রতীক্ষা করছি; মধ্যে মধ্যে আচ্ছন্ন হচ্ছি হতাশায়, নিঃসঙ্গতায়, তরঙ্গের পর তরঙ্গ। সেজন্য আমি উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল; আমি অস্থির, তুলনায় কুতুব স্থিতধী।

দরকার এখন টাকার। অত টাকা কোথায় পাব ? অথচ কুতুবকে কালকেই রওয়ানা করিয়ে দিতে হবে।

নুরু জানিয়েছেন আলতাফ মাহমুদ ধরা পড়েছেন। আমি মুখের দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে সবাই কি ধরা পড়ে যাবে ?

আমি আর সিরাজ ডক্টর এনামুল হকের সংগে দেখা করতে গিয়েছি। দিলু রোডের এক বাসায় আছেন তিনি। বৃদ্ধ সিংহের মতন গর্জন করে উঠেছেন ঃ জালিমরা টিকতে পারে না। আমার মন বলছে বেঈমানদের পতন আসন্ন।

গিয়াসের সংগে আলাপ হয়েছে মরহুম মুকতাদিরের আসন্ন সন্তান সম্ভবা স্ত্রীর প্রসংগে। টাকা আমরা যোগাড় করেছি, ক্লিনিকের ব্যবস্থাও করেছি। কিন্তু মিসেস মুকতাদিরের মা নিজের কাছেই মেয়েকে রাখতে চান। গিয়াস ওঁদের নয়াপল্টনের বাসায় গিয়েছে। কথাবার্তা মা-ই বলেছেন। মিসেস মুকতাদির যতক্ষণ ছিলেন কেঁদেছেন। গিয়াসকে বললাম ওঁর মা যা চান তাই হবে। ডেলিভারির খরচ আমরা দেব।

সৈয়দ নূরুদ্দীন এসেছেন। জিগগেস করলেন নানা কথা। ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছেন।

আমাদের বন্ধু নাজির এক ঘটনা শুনিয়েছেন। এক মা পাগল হয়ে গেছেন। ছেলেকে মেরে ফেলেছে। কেঁদে কেঁদে বলছেন ঃ মেরেছ ভালো, শরীরটা ফেরত দাও, আমার চোখের সামনে কবরে ঘুমুতে দাও। হয় তো ঘটনা সত্য কিংবা নয়; এভাবেই বাংলাদেশের নতুন রূপকথা তৈরি হচ্ছে।

কিছুদিন ধরে স্বাধীন বাংলা বেতারে পরিচিত গলা শুনছিঃ সৈয়দ আলী আহসান, রনেশ দাস গুপ্ত, আবদুল গাফফার চৌধুরী। এঁদের সংগে কি আর কখনো দেখা হবে ?

পত্রিকার নাম আমরা বদলে দিয়েছি ঃ স্বাধীনতার বদলে প্রতিরোধ। পত্রিকার চাহিদা বেড়েছে। আর একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন দরকার। দুলাল এসেছে কুমিল্লা থেকে। কুমিল্লা-চৌদ্দগ্রাম লাইনে পাওয়ার ট্রান্সমিটার সারাবার অভিজ্ঞতা বলল। মিলিটারির হুকুম মতন একদিকে সারানো হয়; অন্যদিকে কমান্ডো তৎপরতায় বিকল হয়ে যায়। মেহারের দিকে যুদ্ধ চলছে, নদীর এপার ওপার। রঘুনাথপুরের বাজার ঘেরাও করে মিলিটারিরা গুলী চালিয়েছে। মরেছে অনেক লোক। রঘুনাথপুর আমাদের গ্রামের কাছেকার বাজার। আরো জানাল রাজনৈতিক বক্তব্য বিশদ ও বিস্তৃত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। নেহাৎ স্বাধীনতার কতা নয়, সঙ্গে থাকা দরকার দেশের ভবিষ্যত পুনর্গঠন; জমি-জমা ব্যবসা-বাণিজ্য; চাকরি; প্রশাসন।

মতির চলে যাওয়া প্রায় স্থির। একদিন এসেছেন; আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

কে জি মোস্তফা আত্মগোপন করেছেন। অথচ তাঁর নামে একটা বিবৃতি মর্নিং নিউজে বেরিয়েছে। হাসানুজ্জামানকে জিগগেস করা জরুরি ব্যাপারটা কি।

বিষ্ণু দে'র কবিতা পড়ছি। লাইন কটি মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে ঢেউ তুলছে ঃ

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায় ?

কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ ?

সারা দেশময় তাঁবু বয়ে কতো ঘুরব ?

পরবাসী কবে নিজবাসভূমি গড়বে ?

দগ্ধ দিন, গুলিবিদ্ধ দিন, বোমা বিদীর্ণ দিন, পরাধীন দিন স্বাধীনতার দিকে যাচ্ছে। রাত্রি তাই দীপাবলী স্বপ্নের দূর-দূরান্তের সঙ্গীতের। আমরা কাজের মজুর হাতে হাতে সংঘাতে যুদ্ধে আনছি অত্যাচারের নিয়ম ভেঙ্গে একাত্মের বিচ্ছেদ; আমরা কাজের মজুর আনছি মননের আর্তনাদ, মৈত্রীর সংবাদ দগ্ধ দিনে পরাধীন দিনে কাজের সঙ্গীত।

আজুকে বলেছিলাম ওঁদের কলেজে বেশ কটি গণকবর আছে সে-সবের ছবি তুলে দিতে। আজু বলেছিল চেষ্টা করবে কাউকে দিয়ে তুলিয়ে দেয়ার জন্য। পেরেছে কি ? আজু জানাল সম্ভব হয়নি। রাজি হয়নি কেউ। আরো জানাল ধীর আলী সর্বস্বান্ত; কিছুদিন আগে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছে। ওকে কিছু সাহায্য করা কি সম্ভব আমাদের পক্ষে ?

চুপ করে থাকলাম। টাকা, টাকা, টাকা। দুদিন আগে একটা কমান্ডো দল এসেছে। ওদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যারা ধরা পড়েছে ওদের পরিবারকে সাহায্য করতে হচ্ছে। কিন্তু টাকা কোথায়ও নেই; যাকে জিগগেস করি, বলে, টাকা দিচ্ছি, টাকা চলে যাচ্ছে; কিন্তু এদের বাঁচাবো কি করে ?

আজু হঠাৎ বলল, তোমাদের ওপর খুব চাপ পড়েছে, তাই না ?

সালমা ধরা পড়েছে, আমাদের সহকর্মী। কিছু জরুরি কাগজ পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল। বাবা মারা গেছেন মধ্য এপ্রিলে; ছোট ভাইটি যুদ্ধে; মাকে ঘিরে আমরা কজন।

মা আমাদের মধ্যে সালমার গর্ব, মা আমাদের মধ্যে সালমার কান্না, মা কেঁদো না।

১৯

ইচ্ছে করে রাত্রির মধ্যে হেঁটে যেতে; ইচ্ছে করে নৌকোর চিহ্নহীন নদীর কাছে যেতে; ইচ্ছে করে, প্রিয়তমা, সর্বস্ব আমার, তোমাকে সর্বক্ষণ কাছে পেতে।

ইচ্ছে করে ঝান্ডা ওড়াতে; ইচ্ছে করে বিদ্রোহী শ্লোগানে কণ্ঠ মেলাতে; ইচ্ছে করে, প্রিয়তমা, সর্বস্ব আমার, তোমাকে বিদ্রোহের অমরত্ব দিতে।

এভাবেই অপেক্ষার গর্ভ থেকে আমি জন্ম দিচ্ছি বিদ্রোহ আমার শহরে। শুনছি তার গর্জন ঊর্ধে, নিম্নে, অন্তরীক্ষে, অন্তরালে, দিগন্তে, দূরে। সমস্ত হৃদয় তাই এক স্থির, স্বচ্ছ দেশ হয়ে আছে। এখন আমার মধ্যে সারাটা শহর, প্রিয়তমা, সর্বস্ব আমার, মেশিনগানের মন্ত্রোচ্চারণে উন্মোচিত ঊষার লাবণ্যসার মেশায়; আমি লিপ্ত তোমাতেই যুগপৎ সব অসম্ভবে। প্রিয়তমা, সর্বস্ব আমার, আমার তো আর কিছু নেই অনিবার্য জয় ছাড়া।

সকালের রোদ দেখছি, এইসব মনে জাগছে। রোদটা মৌমাছি দিনটা প্রজাপতি, গাছটা হাওয়ার মিছিল, আজ রৌদের নবান্ন।

সেই সঙ্গে মনে পড়ছে শক্তি দিয়ে শক্তি বিনাশের কথা। এখন তো এই ঢাকা শহরে, এই বাংলাদেশে শক্তির মুখ চেয়ে আছি, খরায় বৃষ্টির মতন। অথচ জানি শক্তির লুব্ধতা, নিষ্ঠুর সন্ত্রাস, ঐ বৈপরীত্য তীব্র তীক্ষ্ণ; বৈপরীত্যের বিভীষিকা মারাত্মক, তবু শক্তি দিয়ে শক্তি ক্ষয় করা জরুরি। শক্তি, আমার কাছে নীতির প্রক্ষেপণ, নাকি নীতিই, কিন্তু ঐ নীতি স্বাধীন নয়, স্বাধীন নীতি স্বার্থ সংরক্ষক, অন্য অনাচারের উৎস। ঐ নীতির প্রতিক্রিয়া থেকে ফের জন্মায় শক্তি প্রয়োগের মোহ। চক্রাকার ঐ অনাচার কিংবা প্রতিক্রিয়ার বেড়ী ভাঙ্গার এক পথ জড়কে জয় করা, অন্য পথ সমাজে শক্তি ছড়িয়ে দেয়া। এরপর প্রকৃতির দিকে, অন্য পথ মানুষের দিকে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিকে নিরবধি জয় করা, কিংবা ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে সমাজকে অবিরাম সৃষ্টিশীল করে তোলা ঃ শক্তির দীর্ঘদর্শী মানবিক ভূমিকা। মহামানব নয়, একক মানব নয়, নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের কর্তৃত্ব নয় ঃ শক্তির ঐ সব ভূমিকা বিনাশের জন্যই আমাদের যুদ্ধ। বাংলাকে জয় করার মানেই শক্তির লুব্ধতা বিনাশ করা। তা যদি না হয় ? স্বাধীনতার যুদ্ধ ঃ আমাদের মননে ঐ সংকল্প সত্য হোক সত্য হোক। রোদ ঘন পাতায়, আর একটা পাখি ঐ পাতার ফাঁকে রোদ ঠোকরাচ্ছে, ঐ দিকে তাকিয়ে ঐ সব ভাবছি।

যুদ্ধ চলছে, জীবনের বিশালতা এখন ধরতে পারছি। মানুষ ধ্বংস হচ্ছে, ফের বেঁচে উঠছে। গাছ পোড়াচ্ছে, ফের পাতা গজাচ্ছে। পাখিদের বাসা নষ্ট হচ্ছে, ফের বানাচ্ছে। ধ্বংস চতুর্দিকে, কিন্তু কোন কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে না মূলত। জীবনের একই শক্তি টিকে আছে, সেজন্য মানুষ গাছ পশু পাখি সবই ঘুরে ঘুরে বারে বারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মেশিনগান, রাইফেল, ট্যাংক, বোমারু বিমান, যুদ্ধের বিশৃঙ্খলা পাতার ফাঁকের ঐ পাখিটার কিছু বদলাতে পারেনি।

যুদ্ধ আমাদের মানবিক করে তুলছে। ব্যক্তির মধ্যেকার অহংকার, ঔদ্ধত্য, আত্মবোধ গলা টিপে মারছে। আমরা ফের আমি থেকে আমরায় যাচ্ছি, মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছি।

যুদ্ধের মধ্যে থেকে আমি বেছে নিয়েছি শব্দ, ধ্বনি, ছন্দ, লেখার মধ্যে দিয়ে খোদাই করছি নানা নকশা, ঐ নকশার মধ্যে দিয়ে আমি নম্র, নমিত, শান্তি খোঁজ করছি।

সাদউদ্দীন এসেছেন। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়ে দেখা করতে এসেছেন। আতংক সারা মুখে গেঁথে গেছে। হাসি, তা-ও ব্যান্ডেজ বাধা; কথা, তাতেও ভয়ের ছাপ, একটা বিশাল আতংক দু-হাত মেলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে।

জিগগেস করলাম শারীরিক কোন নির্যাতন করেছে কি না। সাদউদ্দীন বললেন, না করেনি। তবে চব্বিশ ঘন্টা মানসিক নির্যাতন করেছে, কখনো সূক্ষ্ম, কখনো স্থুল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করেছে। জিগগেস করেছে পয়লা মার্চ থেকে প্রশ্ন, আরো আগে থেকেও, কে কি করেছে। সব খবর তাদের জানা, সন্দেহ হয় ভেতর থেকে কেউ কিংবা কারা খবর দিয়েছে। গোপন বৈঠক কবে হয়েছে, কারা হাজির থেকেছে, প্রকাশ্য সভায় কারা কি বলেছে, সবই তাদের জানা। প্রতিরোধ আন্দোলনে শিক্ষকদের ভূমিকা তাদের কাছে স্পষ্ট।

সাদ ফের বললেন, আমাদের ছেড়ে দিয়েছে চোখে রাখার জন্য। সম্ভব হলে সরে যেতাম। কিন্তু যাব কই ? ক্যাম্পে সর্বক্ষণ মনে হয়েছে সকাল দেখব কি না।

সাদ আরো বললেন, আহসানের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে যা দরকার করবোখন। গিয়াসকে শুধু বলবেন, একটু সতর্কভাবে কাজ করবার জন্য।

গিয়াসের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হল। অনুরোধ জানালাম ক্যাম্পাস ছেড়ে দেয়ার জন্য।

গিয়াস বললেন, কথা দিচ্ছি ছেড়ে দেব। জানতো বড়োভাই পাকিস্তানে আটকা পড়েছেন। ছোটটা (রশিদ) বিলেত চলে গেছে। ছোট বোনটি সঙ্গে থাকে। ওর জন্যই ভাবনা আমার; যদি কিছু হয়। তাছাড়া ক্যাম্পাসে আছি বলেই কিছু করতে পারছি। যোগাযোগ, টাকা পয়সা দেয়া। যে-সব শিক্ষক মিলিটারির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তাঁদের ওপর নজর রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে।

পিতার মুখের মতন রোদ। গিয়াস কথা বলছেন, আমি রোদের দিকে তাকিয়ে আছি। আমি দেখছি নিসর্গের মধ্যে পিতা আর পূর্বপুরুষেরা হেঁটে যাচ্ছেন; আমি দেখছি গিয়াসের কথার মধ্যে দিয়ে ঢাকা শহরটা আমার রক্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। যা-কিছু করছি তা-ই ঢাকা শহর, বাংলাদেশ, পিতার মুখ; প্রবল হাতে অভিজ্ঞতা উপহার দিচ্ছে। ঐ অভিজ্ঞতা মৃত্যু।

গিয়াস আমাদের মধ্যে চিরকালই একরোখা; চরিত্রবান। কোনদিন রাজনীতি করেনি। কিন্তু ওর মধ্যে চিরকালই উন্মীলিত সরল সততা ঃ মানুষ তার বিশ্বাসের কেন্দ্রে, যখনই মানুষের কোন দুর্গতি হয়েছে, সে ঝড় বন্যা যাই হোক, গিয়াস ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবারেও তাই, দ্বিধাহীন, দীপ্ত, জ্বলন্ত, মশালের মতন।

হঠাৎ গুলীর শব্দ; শব্দে ধ্বনিত সারা শহর, রাত্রির জটিল নিদ্রা গড়িয়ে যাচ্ছে গ্রামে গ্রামান্তরে, জাগ্রত হৃদপিণ্ডগুলির কাছে ঐ শব্দের চিৎকার উঠছে। আর আমিও ভিন্নতর শব্দ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে, গুলীর শব্দের পিছনে ধাওয়া করছি, হাতে আমার সশস্ত্র পাণ্ডুলিপি; সমস্ত স্তব্ধতা পুড়িয়ে সশস্ত্র শব্দের মধ্যে জেগে উঠছি আর শুনছি নিরন্ন

স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠছে জাগ্রত হৃদপিণ্ডগুলি। পাখিগুলি ভরে উঠছে আকাশে আর বাতাসের হাড় শুঁকে শুঁকে কয়েকটি কুকুর কাঁদছে, ভোরের দিকে ফিরে যাচ্ছে সময়, আর একটি বন্দি দিন প্রতীক্ষা করছে শৃঙ্খলা মোচনের, প্রতীক্ষা করছে দক্ষিণের মাতাল-করা-বাতাসের, সমস্ত জানালা খুলে দিয়ে তাকিয়ে আছি এ দিকে, সমস্ত স্বপ্ন পুড়িয়ে খোলা চোখে দাঁড়িয়ে আছি স্তব্ধ ঃ আমি, আমার বন্ধুরা, আমরা ফিরে যাচ্ছি জাগ্রত হৃদপিণ্ডগুলির কাছে।

কুতুব দীর্ঘ এক তালিকা দিয়েছেন ওষুধের। ব্যান্ডেজ থেকে কমবায়োটিক্স। নরসিংদী, মানিকগঞ্জ, বেলাবো নানান জায়গা থেকে তাগাদা এসেছে।

গিয়াস যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন শফিউল্লাহ্‌র সঙ্গে। ভদ্রলোক উৎসাহী ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

শফি ওষুধ যোগাড় করে দিয়েছেন। তাঁর মারফত খবর পেলাম ডক্টর শরীফ কোথায় লুকিয়ে আছেন। ডক্টর শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ জরুরি হয়ে পড়েছে।

শফি জানালেন গুটিকয় মেয়ে কাজ করতে চায়। আমি কি তাদের সঙ্গে আলাপ করতে রাজি ? ভাবলাম অনেকক্ষণ, সংগঠনে মহিলা কর্মী দরকার, সেই সঙ্গে বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। বললাম, ঠিক আছে, আলাপ করব।

শফির বাসা; আলাপ হল তিনজনের সঙ্গে ঃ ঊর্মি, পিউ, মিরো। নানা কথা জানাল তারা; কোথায় কি হচ্ছে এইসব। তিনজনের একটাই বক্তব্য ঃ এক্ষুনি কাজ চাই। আন্তরিকতার সঙ্গে জড়ানো এডভেনচরিজম, যুদ্ধ তো এক হিসাবে এডভেনচার, বিশাল ব্যাপক দূরস্পর্শী এক এডভেনচার বাংলাদেশে। আমার মনের মধ্যেকার ভয়কে ঢেকে দিচ্ছে তিনজনের সাহস, উজ্জ্বল গোলাপের মতন।

আমাদের আরো একটা সাইক্লোস্টাইল মেশিন দরকার। ইয়ানকে বলেছিলাম আমাদের হয়ে কিনে কিংবা যোগাড় করে দেবার জন্য। ইয়ান কিছুদিন ঢাকার বাইরে, কোন খোঁজ নেই। এদের মধ্যে কাউকে পাঠাব ?

বললাম, একটা কাজ আছে। আপনাদের মধ্যে কে ভালো ইংরেজি জানেন ?

ঊর্মি, পিউ দুজনই বলল, মিরো।

ফের বললাম, মিরো আপনাকে একটা জায়গায় যেতে হবে। কাছেই, ধানমণ্ডিতে। ভদ্রলোক আছেন কিনা জানবেন। যদি থাকেন বলবেন জে পাঠিয়েছে, যেন দেখা করে। না যদি থাকেন কবে আসবেন জেনে নেবেন। ঐ বাসা কিন্তু গোয়েন্দারা চোখে চোখে রাখে। অসুবিধা হলে যাবেন না।

স্থির গলায় মিরো বলল, যাব।

কোথায় যেন মিরোকে দেখেছি। কিছুতেই মনে পড়ছে না। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কসাইখানায় স্মৃতি চূর্ণ হচ্ছে, খসে পড়ছে হাড়গোড় করোটি, লোলুপ গম্বুজে দাঁড়িয়ে আছে রাইফেল, মাংসস্তূপ উচ্ছিষ্ট রাস্তায়, তবু আঙ্গুলে প্রস্তুত সশস্ত্র শব্দ, ধারালো পথ বেয়ে যাচ্ছি জলধ্বনির দিকে। আমরা সবাই যাব, যাচ্ছি বাংলাদেশের সব নদীর দিকে;

সমস্ত বাংলাদেশ পুড়িয়ে আমরা সবাই যাব, যাচ্ছি শৃঙ্খলশূন্যতার দিকে। আর এখন বন্দি দিন।

'প্রতিরোধের' ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা বেরিয়েছে। এতে আছে প্রবন্ধ ঃ খুনীরা জবাব দাও; রক্ত ঝরছে কিন্তু কেন; পাকভারত যুদ্ধ ও বাংলার মুক্তি যুদ্ধ; পাক জঙ্গী শাহী বেসামাল হয়ে পড়েছে; মুক্তিবাহিনী সমাচার। আজকের ডাক দেয়া হয়েছে ঃ শোষণ মুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েম কর; গণবাহিনী গঠন কর; দালার সব খতম কর; ভাড়াটিয়া নেতা খতম কর; হানাদার বাহিনী খতম কর; সমাজতন্ত্র কায়েম কর; সর্বস্তরে সার্বিক ঐক্য কায়েম কর। সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ মুক্তি যুদ্ধের রাজনীতি। তাতে আমরা লিখেছি ঃ মুক্তি যুদ্ধের রাজনীতি আছে। এই রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। বাংলার মুক্তি যুদ্ধের চরিত্র হচ্ছে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য বাংলার মুক্তি যুদ্ধে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র পরস্পর প্রবিষ্ট, একে অপরের সম্পূরক, এবং একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নয়; স্বাধীনতার আগে পরে সমাজতন্ত্র নয়। স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র এক সঙ্গে; পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে মানুষে মানুষে অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। সেজন্য মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য পাকিস্তান রাষ্ট্র শক্তির বিনাশ কেবল নয়, নতুন সমাজের প্রতিষ্ঠাও। জাতীয় মুক্তি সংগামের সঙ্গে সেজন্য শ্রেণী সংগ্রামও, শ্রেণী বৈষম্য হ্রাসের সংগ্রামও। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কেন ? বাংলার এই সর্বাত্মক লড়াই বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, একটি রাষ্ট্রীয় সীমার জন্য বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় সীমার জন্য বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। পাকিস্তান রাষ্ট্র, তার শাসকবর্গ ও সেবককূল বাঙ্গালী জাতিকে খর্ব, পঙ্গু, সংকুচিত, লুপ্ত করার চেষ্টায় মেতেছে এবং বাঙ্গালী জাতিকে পশ্চিম পাকিস্তানের দাসে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করেছে। ঐ চেষ্টা, ঐ চক্রান্তের দোসর বাংলাদেশে কারা ? ধর্ম ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্মকে শাসন ও শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্র, সামরিক শক্তি ও বাণিজ্যিক চক্রের ভিত্তিভূমি হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দরুণ ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং ঐ প্রতিফলনের দরুণ তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা জাতি হিসাবে বাঙ্গালীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রচারিত হয়েছে। ঐ কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কখনো সূক্ষ্মা কখনো স্থূলভাবে প্রচার করা হয়েছে ঃ বাঙ্গালী মুসলমানরা হিন্দু বংশোদ্ভব। বাংলাভাষা হিন্দুদের ভাষা, বাঙ্গালী সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি। অর্থাৎ কিনা বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিক বাংলাদেশের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের সামাজিক সত্তার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। ঐ পরিস্থিতির জন্য একদল ভাড়াটিয়া রাজনীতিক প্রথম থেকেই দালালি করেছে, ধর্ম ব্যবসায়ীরা দালালী করেছে। সেজন্য নুরুল আমীন গয়রহ এবং জামাতে

ইসলামের মোল্লারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের দালাল, যন্ত্র, সেবক; তাদের অস্তিত্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত। ধর্ম যখন শোষণের হাতিয়ার তখন ধর্ম মানুষের কোন বন্ধন নয়, এই সত্য আজ উপলব্ধি করতে হবে। শোষণের সঙ্গে জড়িত যে-কোন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণী মুক্তির পথে যখন অন্তরায় তখন সেই ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীকে খতম করা মনুষ্যত্বের জন্য জরুরি এই সত্যও আজ উপলব্ধি করতে হবে। এই কারণেই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামও। কেন শ্রেণী সংগ্রাম ? গ্রামে গ্রামে কিংবা শহরে শহরে শান্তি কমিটির সদস্য কারা ? এই সব সদস্য জোতদার, মওলানা-মৌলভী টাউট শহরের সর্দার, উকিল, কনট্রাকট, তিন মুসলীম লীগ, জামায়েত ইসলামের দালালরা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশের ঔপনিবেশিক অবস্থানের দরুন ও পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক ইসলাম ধর্ম শোষণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের দরুন ঐ সব উল্লিখিত ব্যক্তি কিংবা পেশা কিংবা শ্রেণীর লোকজন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা রকম সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করে এসেছে এবং এই সব সুবিধা বাংলাদেশের ভূমিতে একই সঙ্গে কায়েমী স্বার্থ ও শ্রেণী স্বার্থ। ঐ কারণেই ঐ সব পেশা, শ্রেণী, রাজনৈতিক পার্টির লোকজন বাংলার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শ্রেণী শত্রু। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই জাতীয় মুক্তির লড়াই এবং হানাদার বাহিনীর দেশী তাবেদারদের বিরুদ্ধে লড়াই শ্রেণী লড়াই। যেহেতু এই যুদ্ধ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং একই সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম সেজন্য জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য এবং শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষ্য স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে তোলার সময় এসেছে। অর্থাৎ কিনা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের লক্ষ্য স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। পাকিস্তান আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকেই এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজ রাজ যখন দেশ স্বাধীন করে দিয়েছিল তখন লীগ নেতৃত্ব রাষ্ট্রের মডেল হিসাবে বৃটিশ শাসন ও সমাজের মডেল হিসাবে ইংরেজ ভারতকে ধার করেছিল। ফলে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আমলাতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা ও কনট্রাকটরি সমাজ ব্যবস্থা। সেই সঙ্গে পাকিস্তান লাভ করেছিল বৃটিশ তৈরি একটি পেশাদার সেনাবাহিনী। সেইজন্য ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল কিন্তু স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সেই একই সমস্যা বাংলাদেশেও দেখা দেওয়া বিচিত্র নয় যদি আমরা কেবল মাত্র পাকিস্তানের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করি কিন্তু পাকিস্তানের সমাজ ব্যবস্থা রেখে দিই। নিশ্চয়ই ঐ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ নিয়োজিত নয়।

অভিজ্ঞতা না গর্ত তৈরি করেছে, তাকিয়ে দেখছি। তার মধ্যে আছে ধ্বংস, ভস্মাবশেষ স্বপ্ন, প্রতারণা। বিষয়ঃ আমি; বিশ্লেষণ ঃ আমাকে নিয়ে ; আমি ঃ আমাদের অন্তর্গত ; এভাবেই মুতূল আর্তনাদের জন্ম দিচ্ছি; কাৎরাচ্ছি; রক্তের মধ্যে অনুভব করছি ভীষণ উজ্জ্বল অন্ধকারের ডাক। কোন কিছুতেই নিরাপত্তা নেই; বই, আসবার সামগ্রী, অর্থ সম্মান সবকিছুই মিথ্যে এখন, সবকিছু ছেড়ে জীবন যাপন, কিন্তু, অন্তিমে,

স্বাধীনতা কি নিরাপত্তা দেবে ? গর্ত তৈরি হয়েছে বই, আসবাব সামগ্রী, অর্থ, সম্মানের মধ্যে ; গর্ত তৈরি হবে কি শেষ অবধি স্বাধীনতার মধ্যে ? যে-জীবন আমরা ছেড়ে এসেছি সেই জীবনে কি আমরা ফিরে যেতে পারব ? সঙ্গে কি থাকবে না তখন ঐ সব গর্ত ? গর্তের মধ্যে কিলবিল করছে আমাদের বোকামো, পাগলামো বুদ্ধিমত্তা; আমাদের শৈশব, যৌবন আর মৃত্যু ; আমাদের সমগ্র জীবন যাপন।

এখন এভাবেই বাঁচা; উজ্জ্বল মানুষের মতন চাঁদ; দূরে গুলীর শব্দ মানুষটার দিকে। জামার তলার হৃদপিণ্ড মানুষটা আমাকে দিচ্ছে, আমি গন্তব্যে যাচ্ছি।

২০

বাংলাদেশে সম্প্রতি গণঅভ্যুত্থান চলছে। ঐ উত্থান রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা, সেইসঙ্গে সামাজিক স্বাধীনতার জন্য। বিপ্লবীদের কাজ গণঅভ্যুত্থানকে সাহায্য করা, নেতৃত্ব দেয়া। পারীর কম্যুনে মার্কস যেমন করেছিলেন, কিংবা জুলাইয়ের দিনগুলিতে লেনিন। বিদ্রোহী মানুষেরা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে ; মানুষের বিদ্রোহই ইতিহাসকে স্থবির হতে দেয় না। বাংলাদেশের মানুষ উপনিবেশ হতে অস্বীকার করেছে, আর তাই স্বাধীনতার সামাজিক সম্প্রসারণ অমোঘ করে তুলছে। ক্রমবর্ধমান কর্মহীনতা দূর করতে হবে, জমির ওপর প্রচণ্ড চাপ কমাতে হবে, যুবকদের মধ্যকার ভীষণ অসন্তোষ রোধ করতে হবে। বিদ্রোহী মানুষদের পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের, বাংলাদেশ আর সুবোধ বালক হবে না; বিদ্রোহ এখন, সর্বক্ষণ, চিরকাল বাংলাদেশের ভাষা।

সন্ধ্যা ; মেঘনায়, এখানে; ঝিঁঝিঁর মতন বেজে উঠছে এখানেও দ্রুত মিলিটারি জীপ থেকে জন্ম নিচ্ছে ঝিঁঝিঁর ডাক; দুই স্বর দুই অসম্ভবকে বেঁধে দিচ্ছে কল্পনা, সন্ধ্যা নামছে কল্পনায়, দূরে দূরে বিভিন্ন জানলায়, সন্ধ্যা নামছে সব শব্দ স্তব্ধ করে দিয়ে।

নুরু, সঙ্গে এক কিশোর। পরিচয় করিয়ে দিলেন ঃ নাসিম।

বললাম, বসুন।

নুরু বললেন, একটা কাজে এসেছি। ওদের ওপর একটা বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

নাসিম এবার বলল, আমরা আপনাদের কথা শুনেছি। আমরা একটা বিশেষ কমাণ্ডো ইউনিট, জনা তিরিশেক ছেলের দল ঢাকায় এসেছি। আমাদের ওপর ভার পড়েছে ঢাকা এয়ারপোর্ট উড়িয়ে দেয়ার। আমরা ঠিক করেছি হামাগুড়ি দিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকব, মাইন ও বোমা মেরে এয়ারপোর্ট অকেজো করে দেব। এবারে আপনাদের মতামত বলুন।

একটু চুপ থেকে বললাম, এয়ারপোর্ট অরক্ষিত এখবর ঠিক নয়। আপনাদের যা প্ল্যান তাতে কাজ হয় তো ঠিক হবে না। বানচাল হলেই ঢাকার বাসিন্দাদের ওপর প্রতিশোধ নেবেই মিলিটারিরা। তার জন্য কে দায়ী থাকবে বলুন ?

নাসিম অনেকক্ষণ চুপ থাকল, পরে বলল, তাহলে আপনাদের প্ল্যান কি বলুন ?

আমি বললাম, কাল সন্ধ্যায় ফের আসুন। এয়ারপোর্ট, ঢাকা শহর, ঢাকার সোয়ারেজের ম্যাপ আমি যোগাড় করে রাখব। আলাপ করে ঠিক করব কি করা যায়। ঢাকার যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ইনস্টলেশন আছে সে-সব উড়িয়ে দেয়ার প্ল্যান নেয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে যেখানে যেখানে মিলিটারিরা ঘাঁটি করেছে, আডডা গেড়েছে সেইসব জায়গায় ম্যাপ তৈরি করে হেডকোয়ার্টারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঘটনাগতিক দেখে মনে হচ্ছে শীগগীরই বড়ো যুদ্ধ শুরু হবে। তখন দরকার পড়বে ঐসব ম্যাপের।

নুরু চলে গেলেন নাসিমকে নিয়ে। রাতটা হাহাকারের মতন; দূরে কোথাও কোন ছেলের গলা শোনা যাচ্ছে।

সকাল বেলা আজুদের বাসা। ঈদ এসে যাচ্ছে। আজু ভাইকে নিয়ে বাড়ি যাবে। খোলা স্যুটকেসের সামনে আজু কাঁদছে, আমাকে দেখে বলল, মীরার কথা মনে পড়ছে। বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে কি জবাব দেব বল।

ব্যক্তিক সর্বনাশ সবকিছুর পরপারে। কোন-একজনের আত্মঘাতী মৃত্যু ফিরে ফিরে মনে জাগে। বারে বারে গহনে হারিয়ে গেলেও ফের আগুনের মত জ্বলে ওঠে। ঐ মৃত্যু লুপ্তি নয়, মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই জীবন্ত হতে শুরু করে। হঠাৎ মনে ব্যথা জাগায়। আজু ভুলে যেতে পারবে না, কিংবা আমিও কি পারব ? বলা কি সম্ভব বাবা-মাকে নিজের মেয়ের অমন মৃত্যুর কথা ? নেহাৎ বিবরণ তো নয়, যেমন ঃ আশুগঞ্জে একজন তরুণীকে নেংটা করে হত্যা করেছে; বান্দাখোলায় দুটি ছেলেকে মার সামনেই গুলী করে ফেলে গেছে; ঘোড়াঘাটে হত্যা করে সার সার গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে; কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে একজন যুবক শিক্ষককে পিটিয়ে হত্যা করেছে; চট্টগ্রামে একজন যুবকের পায়ের তলাটা কেটে তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু আজু কি করে বলবে নিজের বোন কি ভাবে মারা গেছে বাবা-মার কাছে ? বাবা মা দুটি শব্দ, দুই ব্যক্তি, ব্যক্তিক সম্পর্ক ঃ মৃত্যু ঐ সম্পর্কে অবিরল, অবরুদ্ধ অক্ষম চিৎকার। আজু, নিবিড় পুকুরের মতন, কাঁদছে কাঁদুক। রোদের মধ্যে, কাজের স্পর্শ ও নরকের মধ্যে গিয়ে আমি ভুলবার চেষ্টা করব কান্না, কান্নার লাল ফুল হৃদয়ে যা জেগে থাকে।

কতগুলি ভাবনা জাগছে। বাংলাদেশে কি জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী আছে ? বাংলাদেশের বিপ্লবের প্রধান শক্তির উৎস কি ? বাংলাদেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হচ্ছে ঃ এরা দুর্বল চরিত্রের লোক ; সমাজের বিত্তবান বলে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এদের আনুগত্য স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক চাপে এরা হঠাৎ সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করে। সমাজতন্ত্রের এই বহিঃপ্রকাশ কি সুবিধাবাদের নামান্তর নয় ? দেশে যুদ্ধ চলছে বলেই জাতীয় বুর্জোয়ারা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী, অন্য অর্থে শোষিত শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে এরা ধনতান্ত্রিক, চারিত্রিক প্রবণতার দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের দোসর, কিন্তু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এদেরকে যুদ্ধ

করতে হচ্ছে পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী ও ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে। দেশ স্বাধীন হলে এরা নেতৃত্বে যাবে, অবস্থার বিপাকে পড়ে সমাজতন্ত্রের কথা বলবে, পাকিস্তানীদের তৈরি শাসনযন্ত্র অব্যাহত রাখবে। সেজন্য দেশের স্বাধীনতা ও দেশের সামগ্রিক বিপ্লবের মধ্যকার যোগসূত্র আরো নিবিড় করা দরকার ; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য দরকার সমাজতান্ত্রিক স্বাধীনতার; জনগণকে বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে আসতে হবে, নেতৃত্বকে শোধন করে তুলতে হবে অবিরাম লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে, তা না হলে বাংলাদেশে সুবিধাবাদ দেখা দেবে। সিংহলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে আমাদের অনেক শিখবার আছে।

অফিস থেকে দরকারি ম্যাপগুলি যোগাড় করে দুপুরে ফিরে এসেছি। বাণী, এয়ারপোর্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে চাকরি করে, ইঞ্জিনিয়ার। ওকে অনুরোধ করেছি এয়ারপোর্টের মধ্যে কোথায় কি আছে ভালো করে চোখে গেঁথে নিতে। আগামীকাল ম্যাপে সেইসব বাণী চিহ্নিত করে দেবে।

সন্ধ্যার একটু বাদে নুরু আর নাসিম এলেন। ম্যাপ নিয়ে আমরা সবাই ব্যস্ত, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি। ঢাকা শহর ম্যাপের সঙ্গে ঢাকা শহর সোয়ারেজের ম্যাপ মিলিয়ে দেখার পর একটা বিশেষ তথ্য ধরা পড়ল; কাওরান বাজারের কাছেকার সোয়ারেজের পিট থেকে যে-লাইন বেরিয়েছে তা উঠেছে গিয়ে এয়ারপোর্টে, এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গারের নিচে ওঠা যায়। মনীপুরী পাড়ার কাছেকার সোয়ারেজ পিটের লাইন থেকে ওঠা যায় এয়ারপোর্টের মধ্যে। ঠিক হল আগামীকাল সন্ধ্যায় নাসিম দুটি ছেলেকে ঐ সোয়ারেজ পিট দিয়ে পাঠাবে, সঙ্গে থাকবে স্পাই ক্যামেরা। আরো জানালাম বাণীর খবর, বাণীর তথ্য ঐ সবের সঙ্গে মেলানো হবে। নাসিম আগামীকাল শহরের বাইরে যাবে। সেজন্য ঠিক হল আগামী পরশু আমরা ফের একত্র হব। আরো জানালাম ঢাকার চার পাশের স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলোর ছোট নকশা তৈরি করিয়ে দেব। নাসিম যাবার সময় সামরিক কায়দায় সালাম দিয়ে নুরু শুদ্ধ চলে গেল।

পরদিন। অনুকে অনুরোধ করলাম গুলশান এলাকার মিলিটারি ঘাঁটিগুলি চিহ্নিত করে দিতে। অনু রাজী হলেন। মিরোর ভাই শওকত ও তাঁর বন্ধু রবিউল, দুজনই স্থপতি, তাঁদের বললাম সদরঘাটের নকশা তৈরি করে দেয়ার জন্য। তাঁরা রাজী হলেন। কমলাপুর বাসাবোর নকশা তৈরি করে দেয়ার জন্য রাজি হলেন নুরু। নারায়নগঞ্জের ভার পড়ল গিয়ে ফজলে রাব্বীর ওপর, অনু ঐ দায়িত্ব নিলেন। ঝুনু তৈরি করে দিল তরাবো ঘাটের নকশা, মেসিনগান পজিশন। কাজী হামিদুর রহমান তৈরি করে দিলেন রায়ের বাজারে নকশা। তাছাড়া যুক্ত সামরিক হাসপাতালের নার্স ও ঝাড় দারদের মাধ্যমে খোঁজ পাওয়া গেল সম্ভাব্য সামরিক প্রস্তুতির। গিয়াসের মাধ্যমে জানা গেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ওপর গোপন হুকুম ঃ ছাত্রাবাসগুলি খালি করে দেয়ার জন্য। কুতুব এসে গেছেন। তিনি জানালেন আর একটি মূল্যবান তথ্য ঃ নিয়াজী

গুলশানের একটি বাড়িতে ও এলিফ্যান্ট রোডের একটি বাড়িতে মধ্যে মধ্যে রাত্রিবাস করেন ও রমনীসঙ্গে মাতোয়ালা হন। ঐ বাড়ি দুটি নকশায় চিহ্নিত করে দিতে হবে।

শফি ডক্টর শরীফের ঠিকানা যোগাড় করে দিয়েছেন। মিরোকে নিয়ে ডক্টর শরীফের বাসায় হাজির হলাম। ওয়ারী এলাকায় নিচের তলায় সরকারি অফিস, দোতলায় তিনি আছেন। আমাকে দেখে ডক্টর শরীফ জড়িয়ে ধরলেন। শুকিয়ে গেছেন, কপালে ভাঁজ পড়েছে। নানা কথা জিগগেস করলেন, নানা কথা জানতে চাইলেন। একটা দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর গলায় ঃ খুব বেশি দিন চলবে না। উঠবার আগে বললাম ঃ আমার হয়ে মিরো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। আপনার ছাত্রী। কোনকিছু দরকার থাকলে বলুন কিংবা খবর পাঠাবেন। ডক্টর শরীফ শুধু বললেন, কথা বলার জন্য মন হাঁপিয়ে ওঠে। মধ্যে মধ্যে এসো। আর মিরোর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি খবর রেখো। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ডক্টর শরীফ, ঠোঁটে মৃদু হাসি, চোখে ঝাপসা। আমার চোখও ঝাপসা হয়ে এলো।

নাসিম এসেছে। দুটো ফটোগ্রাফ দেখাল। এয়ারপোর্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে চীনা ট্যাংক। যে দুটি ছেলেকে সোয়ারেজ পিট দিয়ে পাঠান হয়েছিল তাদেরই তোলা। প্রথম ছেলেটি উঠেছে গিয়ে হ্যাঙ্গারের নিচে, সোয়ারেজের ঢাকনা খুলে দাঁড়াতেই দেখে পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক পাঞ্জাবী সৈন্য। অন্য ছেলেটি উঠেছে গিয়ে পদ্মপুকুরের পাড় দিয়ে এয়ারপোর্টের মধ্যে। সে দেখেছে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান ঘিরে আছে। নাসিমকে দেখালাম বাণীর চিহ্নিত ম্যাপ। এয়ারপোর্ট অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে ঘেরাও করা আছে। তার মধ্যে তিনটি অটোমেটিক, বাকিগুলি ম্যানুয়ালী অপারেটেড। আর আছে চীনা মাল্টিব্যারেল মেশিনগান। মূল ভবনের কাছে বাংকারের নিচে একটা ট্রাকের ওপর স্থাপন করা হয়েছে রাডার। অন্য একটি রাডার দুশো গজ উত্তরে ক্যামোফ্লাজ করা আছে। অনুর চিহ্নিত ম্যাপে দেখা গেল গুলশানের অবস্থা ঃ লেক ঘিরে পিলবক্স, আর রেললাইনের ধারে পিলবক্স, টঙ্গী পর্যন্ত, মধ্যে মধ্যে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান। লেকের উত্তর দিকে বাড্ডা অভিমুখী তৈরি করা হয়েছে ট্যাংকের রাস্তা কমান্ডোরা যাতে শহরে ঢুকতে না পারে। বাসাবো কমলাপুরের জলা জায়গা বরাবর তারকাটার বেড়া তৈরি করা হয়েছে আর পিলবক্স বসানো হয়েছে।

ঠিক হল নাসিম দুদিনের মধ্যে কলকাতা ফিরে যাবে। হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট দেবে। ম্যাপগুলো সঙ্গে যাবে। হেডকোর্টার যদি প্রস্তাবে রাজি হয় পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করা যাবে।

কুতুব চাপ দিচ্ছেন আর একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন যোগাড় করার জন্য। মানিকগঞ্জের দিকে ঐ মেশিন থাকবে। ক্যাপ্টেন হালিম ঐ এলাকায় কাজ করেছেন। যুদ্ধ প্রচার পাশাপাশি দরকার। কুতুব আরো জানালেন মতিঝিলের যে-অফিস থেকে কাগজ বার করা হয় তার ওপর নজর পড়েছে। খুব সম্ভব মেশিন সেখান থেকে সরানো দরকার হতে পারে। আরো জানালেন আমাদের কাগজে সমাজবিরোধী মুক্তিবাহিনীতে

যোগদানকারী অংশদের সম্বন্ধে সোচ্চার লেখা হচ্ছে। সমাজবিরোধীদের ঐ অংশ ছিনতাই, ধর্ষণ, লুট করছে। তাদের হাতে আমাদের কাগজ পড়েছে। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে কাগজের সঙ্গে জড়িত প্রতিরোধ দলটার।

মিরোকে পাঠিয়েছি ইয়ানের খোঁজে। ইয়ান এসে দেখা করেছেন অফিসে। সাইক্লোস্টাইল মেশিনটার ব্যাপারে তাগাদা দিলাম। ইয়ান বললেন, সপ্তাহখানেকের মধ্যে তিনি লন্ডন যাচ্ছেন, এসে মেশিন যোগাড় করে দেবেন।

পাতা ঝরার পালা শুরু হয়েছে শহরটায়। বাসাতে সারাদিন ঘুরে ঘুরে পাতা ঝরে। একদিন রেসকোর্সের পাশে গাড়ি থামিয়ে অনেকক্ষণ পাতা ঝরা দেখলাম। কয়েকটা পাখি মরা পাতা ঠোকরাচ্ছে। একটা ধূসর গন্ধ গাছগাছালি থেকে ভেসে আসছে।

২১

গিয়াসকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সকালে নিয়ে যায় রমনা থানায়, বিকেলে পৌঁছে দেয়।

যন্ত্রণাদীর্ণ আমি। তিনদিন তিনরাত অপমানে ব্যর্থতায় ক্রোধে অস্থির আমি; আমার সহকর্মী আমার বন্ধু জিজ্ঞাসাবাদের নরক সহ্য করছে, আর আমরা কিছু করতে পারছি না; চোখে লেলিহান আগুন, হৃদয়ে ঘৃণার কোলাহল, হৃদয়ে যন্ত্রণা, এভাবেই তিনদিন তিনরাত, এভাবেই দৈনন্দিন প্রতিরোধ ম্লানমুখ প্রত্যহে। ইতিহাসের অধ্যাপক গিয়াস, ইতিহাস তো বাঁচা, প্রতিবাদ, বাঁচা ভালোবাসা, তাই না গিয়াস ঃ তোমার দুচোখে আমরা জ্বলি, দিনরাত জ্বলি বিস্তৃত দেশ জ্বেলে আবিশ্ব আকাশে। বিদ্রোহী মানুষেরা তোমার ইতিহাসে গিয়াস চিরকাল স্বাধীন, মানুষের বিদ্রোহ গিয়াস তোমার ইতিহসে চিরকাল স্বাধীনতার তৃষ্ণার্ত নিখিল খোঁজে।

তিনদিন বাদে গিয়াস ছাড়া পেয়েছে। শীলার কাছে খবর পেলাম ; শীলার মাধ্যমে গিয়াসের কাছে য়ুনিভার্সিটির বরাদ্দ টাকা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম, বলে পাঠালাম দিন দুই বিশ্রাম করে আমার সঙ্গে যেন অফিসে দেখা করে।

গিয়াস এসেছে। ফর্শা মুখে কালো দাগ পড়েছে। ক্লান্ত, ক্ষিন্ন মনে হচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বল ?

গিয়াস আস্তে আস্তে বলল, ইসলামী ছাত্র সংঘের ছেলেরা অভিযোগ করেছিল। সেজন্য ধরে নিয়ে গেছে আমাকে আর ওদুদুর রহমান সাহেবকে। কালো কাপড় মুখে বেঁধে ঐ ছেলেদের একজন আমাদের শনাক্ত করেছে গাড়ির মধ্যেই।

আমি ফের জিগগেস করলাম, কি জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলো ত।

একটু চুপ থেকে গিয়াস বলল, য়ুনির্ভার্সিটির অবস্থা, শিক্ষকদের মনোভাব; এইসব। আসলে একটা কথাই ঘুরে ফিরে তিনদিন জিগগেস করেছে ঃ সে-হচ্ছে

য়ুনিভার্সিটির সাহায্যের সঙ্গে জড়িত কারা। টাকা-কাপড়-চাল-চিনি কারা যোগাড় করে দিচ্ছে। মনে হয় কি জানো ভেতর থেকে কেউ খবর দিয়েছে।

আমি বললাম, ছেড়ে দিয়েছে কেন ?

হাসল গিয়াস, নজর রাখবার জন্য।

আমি ফের বললাম, তোমাকে এবার ক্যাম্পাস ছেড়ে দিতেই হবে। আমার কথা রেখো।

গিয়াস বলল, রাখব। চলি, কেমন।

বললাম, সাবধানে থেকো। শুধু তোমার জন্য নয়, সবার জন্য ঐ একই কথা। গিয়াস তোমার পেছনে এখানকার দালালরা লেগেছে। গিয়াস তুমি এবার থেকে চুপচাপ থেকো। দরকার মতন আমি যোগাযোগ করব।

মনে পড়ছে রোকেয়া হলের বীভৎস কাণ্ড। মধ্যরাত্রে দখলদার সৈন্য, রাজাকার, পশ্চিমা পুলিশ আর অবাঙ্গালী গুন্ডারা মিলে হলের ভিতর ঢোকে মিলিটারি ট্রাক নিয়ে। ইলেকট্রিক তার কেটে দেয়; দোতালায় গিয়ে ওঠে; আর সেই ঘটনার বিবরণ শোনা গেছে পারভিনের কাছ থেকে। ইংরেজির ছাত্রী। কুড়াল দিয়ে দরজা ভেঙ্গে পারভিনদের কামরায় ঢোকে প্রথম, সবকিছু কেড়ে নেয়, পরে পারভিনের গলা টিপে ধরে, পারভিনকে দিয়ে প্রতিটি কামরা খোলায়, দুঘন্টা ধরে তাণ্ডব চলে। মেয়েরা চেঁচিয়েছে, রাতে ধ্বনিত হয়েছে চিৎকার, কেউ আসেনি। উপাচার্য ভবনে পুলিশ প্রহরা, একটু দূরে নীলখেত পুলিশ ফাড়ি, রাস্তায় টহলদার সৈন্য, কেউ নাকি শোনেনি ঐ আর্ত চিৎকার! সবটাই পরিকল্পিত, বাঙ্গালী মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করার কৌশল, অধিকৃত বাংলা দেশে মেয়েদের নসীব।

একদিন এ শহরে আমরা সবাই কাছাকাছি ছিলাম, শব্দের উৎসে সবাই ছুটে যেতাম আনন্দের কোলাহলে, এখন এখানে হানাদারদের যাত্রাপথ, আমরা সবাই সতর্ক, শৃঙ্খলিত শহরে বিষ্ণুদে'র কণ্ঠে বলি ঃ

তাই খোদা নিরঞ্জন থেকে ক্ষুধার্ত গাজনে
বাতাসে বাতাসে মত্ত অপলাপ আছড়ে ছড়ায়,
তাই ধর্মরাজ মৃত্যু, তাই মাতে মহিষ আকাশ,
প্রাণতীর্থে জনস্রোত মৃত্যুভয় পায়ে দ'লে দ'লে
শূন্যে শূন্যে ভ'রে তোলে শূন্যের সরকারী হাহাকার–
জীবনই মৃত্যুর বলি, শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে!

উন্মুল, পেছনে ফেউ লাগা ধ্বংস দীর্ণ, আমরা দেখছি চব্বিশ বছরের সত্য খসে খসে পড়ছে। সত্যে আগুন ধরাচ্ছি আমরা সবাই মিলে। আগুন সূর্যাস্তের আকাশ কিংবা সুর্যোদয়ের; বনস্থলী গ্রামে বস্তিতে রাস্তায় আগুনের সাতরঙ্গা স্বস্তি ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমাদের জীবন-যাপন, শীতের এই খরদিনে আমরা সবাই চাই আগুনের সাহস ঃ

হৃদয়ে শরীরে চেতনায় বোধে। বাতাসে ঠাণ্ডার ধার, গাছগুলিতে পাতা ঝরার কূজন, বন্দী শহরে শীত; তারপর কি ধনধান্য পুষ্পভরা যাত্রার শেষ ?

ঝুনুর রিপোর্ট ঃ ১লা নভেম্বরে ঘোড়াশাল ন্যাশনাল জুট মিলের বাঙ্গালী অফিসার আর কর্মীদের পাকিস্তানী সৈন্যরা সারসার গুলী করে মেরেছে।

জাতিসংঘ ত্রাণ মিশন পরিচালনাধীন কোস্টারগুলির সকল ক্রু অধিকৃত বাংলাদেশে গেরিলা কার্যক্রমের জন্য কাজ করতে অসম্মতি জানিয়েছে। কোস্টারগুলি এখন চট্টগ্রাম বন্দর ছাড়িয়ে দূর সমুদ্রে।

জাতিসংঘের সূত্র অনুযায়ী ঢাকা শহরে এখন ছ'দিনের খাদ্য আছে। জাতিসংঘ ঢাকাকে আন্তর্জাতিক দূর্গত শহর হিসাবে ঘোষণা করতে চাচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি সাপেক্ষে খাদ্য চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য।

পিউ-উর্মির রিপোর্ট ঃ ১৫ই নভেম্বর হাতীরপুল এলাকা থেকে ডাক্তার আজহার আলী ও ডাক্তার হুমায়ুন কবীরকে সকাল সাড়ে আটটার সময় কয়েকজন রাজাকার ও পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সকালবেলা বাইরে যাবার জন্য গলির মুখে এলে গুটিকয় মুখে কালো কাপড় পরা ব্যক্তি তাঁদের ধরে নিয়ে যায়। আত্মীয় স্বজন থানা এবং মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে তাঁদের খোঁজ করেন। কিন্তু থানা এবং হেডকোয়ার্টার থেকে জানানো হয় ঐ রকম কোন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। পরদিন সকালবেলা ফকিরাপুলের নিচে ঐদুজন ডাক্তারের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কিন্তু লাশ দেখে চেহারা শনাক্ত করা যাচ্ছিল না। বাসা থেকে বেরোবার সময় তাদের দুজনের পরনে স্যুট ছিল। কিন্তু এখন তাঁদের পরনে শুধু জাঙ্গিয়া এবং ছেড়া সার্ট। তাঁদের শরীরে মারের চিহ্ন আর সারা মুখ বেয়নেট দিয়ে খোঁচান। ডাক্তার আজহার আলী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের রেডিওলজিস্ট ছিলেন আর হুমায়ুন কবীর এই বছরই ঢাকা ম্যেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে বার হয়েছেন। তাঁদের দুজনের বাড়ি ফরিদপুর।

ওয়ারেস সাহেবের রিপোর্ট ঃ ১৭ই নভেম্বর ঢাকার দক্ষিণের বুড়ীগঙ্গার অপর পারের চৌদ্দটি গ্রাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী রাজাকার, অবাঙ্গালী গুন্ডা, মুসলিম লীগ ও ইসলাম পন্থী দলগুলির সাহায্যে পুড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামগুলির নাম হচ্ছে ঃ (১) নান্দাইল, (২) রুইতপুর, (৩) শিকরামপুর (৪) সৈয়দপুর (৫) কামার খাঁ, (৬) গোয়াল খালি, (৭) গাঠা গাঁও, (৮) আটি, (৯) গাছ গাঁও, (১০) মোরাজী গাঁও, (১১) রুহিলা, (১২) খলমা, (১৩) কামরাঙ্গীর চর ও (১৪) খোলমারা। গ্রামগুলি বুড়িগঙ্গা থেকে ধলেশ্বরী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেকটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ১৬ই নভেম্বর রাত থেকে সামরিক সরকারের আদেশে এই হত্যাকাণ্ড শুরু হয়। ১৭, ১৮ ১৯ এই তিনদিন এবং তিনরাত এই গ্রামগুলির নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা করা হয়, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সশস্ত্র পাকফৌজ ও রাজাকাররা পরিকল্পিত ভাবে এই গ্রামগুলি হামলা করে এবং অবাঙ্গালী, মুসলিম লীগ, ইসলামপন্থী দলগুলির লোকেরা ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী যখন পালাতে চেষ্টা করেছে তখন তাদের ওপর গুলি চালান হয়। যারা

ঘরের ভেতর লুকিয়ে ছিল তাদের বাইরে টেনে বের করে মারা হয়। মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালান হয়। আনুমানিক এক হাজারেরও বেশী লোক নিহত হয়েছে এবং ছয়শত বাড়ি সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়েছে। আহতের সংখ্যাও হাজার খানেক হবে। গ্রামগুলির অধিবাসীরা প্রায় সবাই ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবি। রুইতপুর ও শিকরামপুরের বাজার দুটি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ব্যবসা কেন্দ্র। এখানকার তৈরি লুঙ্গীর চাহিদা বাবুরহাটের লুঙ্গীর মতন বাংলার সর্বত্র। এই বাজার দুটির সমস্ত দোকানপাট সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত এবং সারা বাজার ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। এই ধ্বংস লীলায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আটি এবং কামরাঙ্গীর চর গ্রাম দুটি। শুধু মাত্র আটিতেই তিনশত জন হতাহত হয়েছে এবং দুই শত গৃহ ভষ্মীভূত করা হয়েছে। গ্রামগুলির মধ্যে আটি ছিল সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু। সেখানে নির্বিচারে রাজাকার বাহিনী পাকফৌজের সাহায্যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। গোয়ালখালি গ্রাম নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ জানান যে ঐ গ্রামে পঞ্চাশ জন জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রামটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। নওয়াবগঞ্জ ও মোহাম্মদপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত কামরাঙ্গীর চরে প্রধানতঃ মোহাম্মদপুর থেকে আগত অবাঙ্গালীরা লুটতরাজ, হত্যা এবং অগ্নি সংযোগ করেছে। প্রাণভয়ে ভীত পলায়নপর লোকদের ওপর নির্বিচারে গুলীবৃষ্টি করা হয়েছে এবং মৃতদেহগুলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

কুতুব এসেছেন, সঙ্গে এক যুবক। পরিচয় করিয়ে দিলেন ঃ খোদাদাদ, ছাত্র য়ুনিয়নের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। কথা প্রসঙ্গে খোদাদাদ জানালেন মাসুদ আহমেদ মাসুদ তাঁর ভাই। ছাত্র য়ুনিয়নের কর্মী, সংস্কৃতি ফ্রন্টের কর্মী। জিগগেস করলাম মাসুদের কথা। খোদাদাদ জানালেন মাসুদ ঢাকাতেই আছে। পঁচিশে মার্চের অপারেশন তার স্নায়ুর ওপর আঘাত হেনেছে। অনেকটা অসুস্থ এখন। ছাত্রফ্রন্টের অবস্থা জানতে চাইলাম। খোদাদাদ বললেন, এখন অবস্থা ভালো, সংগঠন ফের গড়ে উঠছে। বিশেষ করে কাগজটা ছাত্রদের মনোবল সুস্থ ও শক্ত করে তুলেছে। বেশ সংখ্যক ছাত্র যুদ্ধে যাচ্ছে, দেশের মধ্যকার প্রতিরোধে যোগ দিচ্ছে। স্কুল-কলেজ-য়ুনিভার্সিটি আমরা অচল করে রাখব। লক্ষণীয় হচ্ছে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে।

কুতুব বললেন, সাভারের ন্যাপ নেতা দেওয়ান মোহাম্মদ ইদ্রিস আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছেন সংগঠন ও পত্রিকার ব্যাপারে। দেওয়ান সাহেব ক্যাপ্টেন হালিমের নেতৃত্বে ঐ এলাকায় কাজ করেছেন। কবে যাবেন বলুন ?

বললাম, আপনি সব ব্যবস্থা করে খবর দেবেন।

বিভিন্ন জনের রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করলাম। ঠিক হল ইন্টারকনের বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে আমি ঐ সব রিপোর্ট পৌছে দেব, আর কুতুব পৌছে দেবেন আগরতলায়।

সরকার ভোজী দুপেয়ে জীব আমলাদের কথা মনে জাগছে। আমলাতন্ত্রের অবস্থা দুনৌকোয় পা দেয়ার মতন। যে-সব আমলাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তারা স্বাধীনতা

চান স্বস্তির জন্য, শাসন উদ্ভূত ক্ষমতার অবাসনের জন্য নয়। স্বাধীনতার পর খুব সম্ভব আমলাতন্ত্র অন্যতম সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আমলাতন্ত্র সরকারের কর্মক্ষেত্র, তার নিত্য দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিয়মিত নির্বাহের জন্য প্রয়োজন। শ্রেণী সমাজ নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন-বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য ও কোন-বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতিপত্তি নেহাৎ স্বার্থের জোরে টিকে থাকে না, সেই স্বার্থের সঙ্গে গোটা সমাজের অগ্রগন্য প্রয়োজনের সঙ্গতি দরকার। শ্রেণী সমাজের পর্যায়ে-পর্যায়ে পরিবর্তমান, উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের যে-ভূমিকা, সেই ভূমিকা পালনের ওপর নির্ভরশীল বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা। নেতৃত্বদান কেবল অর্থনৈতিক নয়, উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে পর্যায়ে-পর্যায়ে মানুষের সামাজিক কর্মে, সংস্কৃতিতে তা প্রকাশমান। ঐ প্রকাশমানতার মধ্যে নিহিত রাষ্ট্রশক্তির প্রকৃতি ও পরিকল্পনা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার ও পরিচালনার শ্রেণীগত যোগ্যতা নির্ভরশীল ফের সামাজিক নেতৃত্বের সক্ষমতার ওপর, একটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য নির্মাণ ও পরিচর্যার ব্যাপারে ঐ শ্রেণীর ভূমিকার সার্থকতার ওপর। ঐ ভূমিকার বিচারে উন্নততর, পরিবর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তনা মৌল এক শর্ত। কোন-বিশেষ শ্রেণী, কোন-বিশেষ রাজনৈতিক দলের রীতিনীতি, স্বার্থ, কর্মকাণ্ড থেকে উন্নতির ঐ মাপকাঠি নষ্ট, বিযুক্ত হলে ঐ বিশেষ শ্রেণী ঔ বিশেষ রাজনৈতিক দলের চেতনা ও কর্মের সামাজিক জোরের ক্ষয় হয়। তখন শাসন ক্ষমতা পরিচালনার জন্য ঐ শ্রেণী ঐ রাজনৈতিক দর আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, ফলে আমলাতন্ত্রের প্রশাসনিক ভূমিকা দৈনিক দায়িত্ব পালনে অধীশ্বর হয়ে ওঠে। তখন আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এবং রাজনীতির বিকৃত লোভের মধ্যে লেনদেন শুরু হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াদের বিকাশ আড়ষ্ট, সামাজিক ভূমিকা উৎপাদন বিমুখ, ঐ কারণে পরিবর্তমান সমাজে ঐ শ্রেণীর আধিপত্য চূড়ান্ত নয়। ঐ কারণে বুর্জোয়াদের মধ্যে সমানে দুটি ঝোঁক দেখা দেবে। এক ঝোঁকে থাকবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে বুর্জোয়াদের দুর্বলতা ঢেকে নেয়া, শক্তি প্রয়োগের মাদ্যমে বুর্জোয়া আধিপত্য কায়েম করা। অন্য ঝোঁকে থাকবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লাড়াইয়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থাকার দরুণ গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রগতির পথ খোঁজা। বুর্জোয়াদের মধ্যে ঐ দুই ঝোঁক সমান বলে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনীতি জড়িত বলে, আমলারা রাষ্ট্রের সেবক বলে সরকারী কর্মক্ষেত্রে রাজনীতির দলগত কিংবা ব্যক্তিগত চাপ ও বিরোধীতা সোচ্চার হবে, ফলে আমলাতন্ত্র রাজনীতির বিকৃত পদ্ধতির দরুণ তার লৌকিক উদ্দেশ্য ও সামাজিক সঙ্গতি থেকে বিযুক্ত হয়ে যাবে। ক্ষমতার প্রয়োগে বুর্জোয়াদের আচরণ ও কর্মকান্ড যদি সামাজিক উদ্দেশ্যে সংলগ্ন না হয় তাহলে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি দলবাজির লোভে নষ্ট হবে। স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে যে-বিপুল আগ্রহ জাগাবে তা বিভ্রান্তিতে, বিচ্যুতিতে, দলবাজিতে, কলহে, বিশৃঙ্খলায় বিকৃত লোভের মধ্যে নষ্ট হবে। রাজনীতির কেন্দ্রীয় ভূমিকার বিচ্যুতি যাতে না হয় সেদিকে সজাগ থাকা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ রাজনীতি স্ববিরোধী কার্যক্রমে

আবদ্ধ হলে ক্ষমতার প্রয়োগ, জ্ঞানের ব্যবহার, মননের গতি সামাজিক উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা থেকে বিযুক্ত হয়ে যাবে। ঐ ভবিষ্যতই সর্বনেশে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমলাতন্ত্র ঢেলে না-সাজানো ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম অসার্থকতা, ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম দুর্বলতা, ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। ভারতের ব্যর্থতা থেকে আমাদের শেখা জরুরি।

জাহানারা ইমামের বাসা। দুই ছেলে রুমী-জামি, স্বামী, স্বামীর ভাইপো শুদ্ধ অগাস্টে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। স্বামী, ছোট ছেলে জামি, ভাইপোকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু রুমীর খবর নেই, মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকার অপারেশনে যুক্ত। জাহানারা ইমাম চুপ করে বসে আছেন।

আজু ফিরে এসেছে বাড়ি থেকে। ঠোঁট ফাটা, কালো হয়ে গেছে চেহারা। একটু হেসে বলল, রেল অচল। তাই হাঁটতে হয়েছে কুড়ি মাইল বাস ধরার জন্য। আমি তো ফিট হয়ে গিয়েছিলাম।

জিগগেস করলাম, গ্রামাঞ্চলের অবস্থা কেমন ?

আজু জানাল, গ্রামের দিকে রাজাকারদের উৎপাত অনেকটা কমেছে। পাকিস্তানী সৈন্য এখন শহরে, গ্রামের দিকে যেতে ভরসা পায় না। তবে মানুষ খেতে পাচ্ছে না, সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে লুটতরাজ। ফেরদৌস ফের লড়াইতে গেছে। বাড়ি আসা ছেড়েই দিয়েছে।

আজুর বন্ধু নাজ, কাঁদছে। স্বামী মতিন নোয়াখালী কলেজের অধ্যাপক, রওয়ানা দিয়েছে ঢাকা আসার জন্য। স্টিমার মুক্তিবাহিনী ডুবিয়ে দিয়েছে। দিন পনেরো খবর নেই। নাজ সন্তান সম্ভবা, চিন্তায় উদগ্রীব, উদ্বিগ্ন। বললাম, কোন খোঁজ পেলে জানাব।

নাসিম ফিরে এসেছে। জানাল হেডকোয়ার্টার আমাদের নকশা ও ম্যাপ পেয়ে খুশি হয়েছে। দারুণ কাজে লাগবে। আরো জানাল ঢাকার ডিটেল একটা ম্যাপ, ঢাকা শহর প্রতিরক্ষার ডিটেল নকশা তাঁরা চেয়েছেন। বড়ো রকমের যুদ্ধ শুরু হবে ঃ স্থল, বিমান, নৌ তিন ফ্রন্টেই। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফিরে যাব। সম্ভব হবে কি ঐ সব তৈরি ও যোগাড় করে দেয়া ?

বললাম, করে দেব।

একটাই ভাবনা জাগল ঃ সবাইকে হুঁশিয়ার করে দেয়া। ঢাকা শহর ছেড়ে সবাই সরে যাক। মানুষ বাঁচুক, মানুষকে বাঁচাতেই হবে।

নভেম্বরের শেষ দিনগুলি রৌদ্রের প্রবলতায় আকাশে উড়ে যাচ্ছে। মেঘের রোদের সোনা, সারাটা দিন সোনার একটি কুসুম। বাতাসে ঠাণ্ডার হাহাকার, তার মধ্যে দুঃখী শহরটা শূন্য হৃদয় মেলে ধরে। দুঃখী শহরটা একা স্বপ্ন দেখে আর আমার মধ্যে মানুষদের কান্না। আমি অস্থির আর স্বপ্ন দেখি, শহরটা স্বপ্ন দেখে আর অস্থির হয়ে ওঠে। আমরা স্বপ্ন দেখি স্বপ্নের আর পরস্পরের।

২২

১লা ডিসেম্বর। কুতুব এসেছেন। বললেন তাঁকে সরে যেতে হবে। তাঁর মাথার ওপর হুলিয়া বেরিয়েছে। দিন সাতেকের জন্য গ্রামের দিকে যাবেন। পরে এসে দেখা করবেন।

২রা ডিসেম্বর। বড়ো যুদ্ধ শুধু হয়েছে। যশোর ও ঢাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

বিকেলে নাসিম এসেছে। জানাল দশ তারিখের মধ্যে ফের কলকাতা রওয়না হবে। ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ডিটেল নকশা যেন তৈরি করে রাখি।

নুরুর খবর নেই। মিরোকে পাঠিয়েছি চিঠি দিয়ে। ঢাকা শহর থেকে লোকজন সরতে শুরু করেছে।

৩রা ডিসেম্বর। সন্ধ্যাবেলার রেডিও খবরে জানা গেল পাকিস্তান বিমান বাহিনী অমৃতশর, দিল্লী, আগ্রা আরো অন্যান্য জায়গায় হামলা করেছে।

মুন্নীকে বললাম রাত্রে বিমান হামলা হবে। দেয়াল ঘেষে বিছানা করেছে মুন্নী। উল্লাস ও আতঙ্ক একই সঙ্গে। ভারতীয় বিমান আক্রমণ আমরা প্রার্থনা করেছি কবে থেকে। উল্লাস শত্রু নিধনের পালা শুরু হচ্ছে বলে। আতঙ্ক বে-সামরিক এলাকায় যদি বোমা পড়ে। ঢাকা শহর তাহলে গুড়িয়ে যাবে। ভরসা আমাদের দেয়া তথ্য, নকশা, ম্যাপ হেডকোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছেছে।

শুক্রবারের রাত। উজ্জ্বল চাঁদ, আকাশ নীলে আছন্ন। ভোর রাত থেকে শুরু হয়েছে বিমান আক্রমণ; অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান পাল্টা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে।

বিটু আমার বুকের মধ্যে সেধিয়ে আছে।

৪ঠা ডিসেম্বর। সকাল থেকে শুরু, প্রবল স্বচ্ছ রৌদ্রের মধ্যে উড়ে উড়ে আসছে ভারতের বিমানগুলি। পাকিস্তানের জেট পাল্লায় হেরে যাচ্ছে। সাইরেন বেজে চলেছে থেকে থেকে। ছাদে মানুষ, আনন্দে অধীর, যুদ্ধ দেখছে। নিঃসংশয়, নির্ভীত ; মিত্রপক্ষের বিমান আমাদের মারবে না। এয়ারপোর্ট জ্বলছে।

৫ই ডিসেম্বর। বিকেলে নাসিম এসেছে। দেখাল ফটোগ্রাফ, তিন তারিখ রাত্রের বিমান অক্রমনের ছবি। এয়ারপোর্ট জ্বলছে, চীনা ট্যাঙ্ক দাঁড়ানো, রাডার বিধ্বস্ত। সোয়ারেজ পিট দিয়ে গেছে, তুলেছে ছবি।

নাসিম আরো জানাল তাদের একদল রওয়ানা হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে আছে সাভার ট্রান্সমিশন সেন্টারের নকশা, গোদনাইলেন নকশা। রাডার আর কাজ করবে না। সাইরেন ঠিক মতন আর বাজবে না। আরবান ডাইরেক্টরের বেসমেন্টে ম্যানুয়ালী অপারেটেড সাইরেন ব্যবস্থা আছে, তা নষ্ট করে দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

৬ই ডিসেম্বর। অফিসে এসেছি। সবাই উত্তেজিত, আনন্দিত, আতঙ্কিত। কেউ কেউ শহর ছাড়ার উদ্যোগ নিচ্ছে।

গিয়াস এসেছে। কি ব্যাপার ? পাঁচ তারিখ বিকেল বেলায় পিলখানার গেটে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা গ্রেনেড ছোড়ে। পাহারারত সৈন্য জখম হয়। আধ ঘন্টা বাদে ঐ রাস্তা দিয়ে স্থানীয় ডাক্তার স্কুটারে করে যাচ্ছিলেন। পাকফৌজ গুলী করে, সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক মারা যান। তাঁর দাফনের জন্য টাকা দরকার। আড়াইশ টাকা আমার পকেটে ছিল। গিয়াসের হাতে তুলে দিলাম। বললাম, গিয়াস তুমি আর ক্যাম্পাসে থেকো না। সবাইকে বলো ক্যাম্পাস ছেড়ে দেওয়ার জন্য। গিয়াস বলল, ছেড়ে দেব। সবাইকে হুঁশিয়ার করে ক্যাম্প ছেড়ে যাব।

আজ ভারত আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

৭ই ডিসেম্বর। লিলি জিগগেস করল কি করব। বললাম তৈরি থেকো। যদি দরকার পড়ে সরে যেতে হবে।

ব্যাংক থেকে টাকা তুললাম কিছু। খাবার-দাবার কিনলাম। লোকজন শহর ছেড়ে যাচ্ছে। এক মহিলা স্যুটকেশ হাতে হেঁটে চলেছেন।

যশোর শহরের পতন ঘটেছে। মিত্র বাহিনী ঝিনাইদহ সড়ক দখল করেছে।

৮ই ডিসেম্বর। নুরু এসেছে। জানাল কুতুব গোপনে শহরে এসেছেন। সন্ধ্যায় দেখা করবেন।

সন্ধ্যার একটু পর কুতুব এলেন। জানালেন যুদ্ধের অগ্রগতি। মিত্র বাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের এখন কি করা দরকার ? সিদ্ধান্ত হল ঃ এক নম্বর, হেডকোয়ার্টারকে জানানো মুক্তিবাহিনী যাবে সর্বপ্রথম ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। আমাদের জাতীয় মর্যাদার জন্য এটা জরুরি। দুনম্বর, ঢাকা শহরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিক কমিটি গঠন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করা ঃ লুঠতরাজ, অরাজকতা বন্ধ করা। তিন নম্বর, কাগজের সংখ্যা অবিলম্বে বার করা।

৯ই ডিসেম্বর। সকালবেলা বুসকে এসেছে। জানাল জেনারেল নিয়াজী আন্তর্জাতিক রেডক্রসের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

নাসিম এসেছে। বলল ওরা আগামীকাল রওয়ানা হবে। আমার পক্ষে কি ওদের আরিচাঘাট পর্যন্ত পৌছে দেয়া সম্ভব হবে ? যে গাড়ির ওপর ভরসা করেছিল তা পাওয়া যায়নি।

ঢাকার প্রতিরক্ষার ডিটেল নকশা ও ঢাকা শহরের ডিটেল ম্যাপ নামিকে দিলাম। বললাম, যাব। মিরোর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানালাম আগামীকাল আমার সঙ্গে যেতে হবে।

১০ই ডিসেম্বর। পেট্রোল পাম্প সামরিক সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। শহরময় পেট্রোল সংকট। ঝুনু ওর গাড়ি থেকে পেট্রোল দিল। মিরোকে ওদের বাড়ি থেকে তুলে নিলাম। নাসিমদের বাসা থেকে নাসিমদের। যেন আমরা একটি পরিবার, ভই বোনের দল, চলেছি রাজশাহী, মার অসুখ, দেখা করতে। মিরো, নাসিম, আলম, টয়।

আলমের আর টয়ের জুতোয় ফলস শুকতলি, নকশা লুকনো; স্যুটকেশে শাড়ি, ওষুধপত্র, টুথ ব্রাশ; আর স্যুটকেশের ফলস প্যাডিং এর মধ্যে ঢাকার ম্যাপ।

মীরপুরের পুল পেরিয়ে গেলাম। সাভারের রাস্তায় মানুষের মিছিল, হেঁটে চলেছে পুরুষ আর মহিলা, মা আর সন্তান, হেঁটে চলেছে মানুষ আর মানুষ আর মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। রাস্তায় দু-তিনটি গাড়ি দেখা গেল, সবই উত্তরে চলেছে। আর দেখা গেল মিলিটারির গাড়ি।

গাড়ির মধ্যে তর্ক চলছে। মিরো আর নাসিম ছাত্র য়ুনিয়নের সদস্য; টয় আর আলম ছাত্রলীগের। দুই সংগঠনের বীরত্ব নিয়ে প্রবল তর্ক; তত্ত্ব আর তথ্য একাকার। আমার চোখ বাইরে, গ্রামগুলি চুপ, কোথাও কোন সাড়া নেই।

মানিকগঞ্জে চেক পোস্ট। মিলিটারি জিগগেস করল কোথায় যাচ্ছি কেন। বললাম নাসিমরা আমার ভাই, অসুখ, গাড়ি মেলে না, তাই আরিচাঘাটে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

আরিচাঘাটে চেক পোস্ট। এবারে সব খুলে খুলে, জিনিসপত্র দেখে দেখে।

ফেরী নেই। দুটি ফেরীর একটি বিমান হামলায় ডুবে গেছে। অন্যটি ছাড়বে না। নাসিমদের বারো তারিখের মধ্যে কৃষ্ণনগর হয়ে কলকাতা পৌঁছাতে হবে। টয় বলল, আমরা চলে যেতে পারব।

ফিরতি পথ। চারটে থেকে কার্ফু। রোদ, গরম, ধুলো; মিরো ক্লান্ত আর অবসন্ন। আমরা কেবল ঢাকা মুখী; বাকি সবাই ঘাটের দিকে যাচ্ছে কিংবা নানা গ্রামে।

সাভার ফার্মের কাছে যখন পৌঁছেছি বেলা তিনটে। ট্রান্সমিশন সেন্টারের ওপর রকেট ছুড়ছে মিত্রপক্ষের বিমান। দশমিনিট বাদে ঐ পথ পেরোলাম। আগুন জ্বলছে। টুকরো শাল বন; টুকরো কাঠাল বাগান; সাভার বাজারের মুখ; দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ।

মীরপুর পুল পেরোবার পর ফের চেকিং। এবার রাজাকার আর আলবদর। নাম থেকে আইডেনটিটি কার্ড; কেন আরিচা ঘাটে গিয়েছি; সঙ্গের মেয়েটি কে।

জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়েছে। চারটে বাজার পঁচিশ মিনিট বাকি।

ধানমন্ডির রাস্তা মানুষ আর গাড়িতে এলোমেলো ; ইয়ান একটা গাড়িতে; সবাই ছুটছে চারদিকে। আমাদের কাপড়ে আর মুখে আর গাড়িতে ধুলোর সর। ঠিক চারটেয় মিরোদের বাসা। এক পেয়ালা চা না খেলে ওঠা অসম্ভব, এমন ক্লান্তি। মিরো চা বানাতে গেলো।

ফেরার সময় রাস্তা ফাঁকা। কার্ফু শুরু হয়ে গেছে। পীলখানার গেটের সৈন্যরা কিছু বলল না। ন্যুমার্কেটের মোড়ে জনা পাঁচেক সৈন্য; গাড়ি থামাতে বলল। জোরে গাড়ি চালিয়ে এলিফ্যান্ট রোডে মোড় ঘোরালাম। পিছনে গুলীর শব্দ।

বাসায় এসে দেখি ঝুনু আর আরু বসে আছে। ওদের বললাম চলে যেতে, সাবধানে।

১১ই ডিসেম্বর। কুতুব এসেছেন, তাগাদা দিলেন লেখাটার জন্য। বললাম বিকেলে পাবেন। কুতুব জানালেন মিত্রবাহিনী ঢাকা ঘিরে ধরেছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে ঢাকা মুক্ত হবেই।

প্রতিরোধের সম্পাদকীয় ঃ বিজয়ের পূর্বক্ষণ। 'ঢাকা শহর মুক্ত হতে চলেছে। বহু মৃত্যু, ইস্পাত দৃঢ় প্রতিরোধ, রক্ত উজ্জ্বল বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে বিজয়ী জনতা আজ ঢাকা শহর ঘিরে ধরেছে। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানের শক্ত ঘাটি, তাবেদারদের ডেরা, দালালদের বাসস্থান ঢাকা আজ আতঙ্কে শিহরিত; সেই সঙ্গে মুক্তির আনন্দে উদ্বেল, কারণ ঢাকা বিপ্লবের জননী, বিদ্রোহের পতাকা; কারণ ঢাকা চিরকালই বিদ্রোহীর সম্মানে সমুন্নত। এই সম্মান চিরকাল অটুট থাক, চিরকাল নিষ্কলঙ্ক থাক, কোনদিনও যেন ঢাকা শহর তার মাথা না নোয়ায়।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর দৃপ্ত কুচকাওয়াজ ঢাকা শহরের চারপাশে; তারা এগিয়ে আসছে ডেমরা থেকে টঙ্গী থেকে, সাভার থেকে, জিঞ্জিরা থেকে, তাদের সঙ্গে আসছে সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা আকাঙ্খা ভবিষ্যত, বাংলাদেশের বিপ্লব। এই বিপ্লব কোন দলের নয়, সকল বাঙ্গালীর; এই বিপ্লবের অধিকার কোন দলের নয়, সকল বাঙ্গালীর; বাঙালী জনসাধারণ তাদের রক্ত দিয়ে, প্রতিরোধ দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে, সেই ভিত্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং স্বাধীনতারও সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। বাংলাদেশের বিপ্লবের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র এবং বাঙ্গালী জনসাধারণের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সমাজতন্ত্র; ঢাকা শহরের আসন্ন মুক্তির পূর্বক্ষণে এই সত্য আজ অনুভব করতে হবে। সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তিতে আছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী চেতনা; সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অছে সর্ব প্রকার শোষণ বিরোধী চেতনা; সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত ভিত্তিতে আছে মনুষ্যত্বের চেতনা; বাংলাদেশের বিপ্লবের পশ্চাদপত এ সবই। এই কারণে বাংলাদেশের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক সমর্থন মিলেছে সোভিয়েট ও পূর্ব য়ুরোপের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি তেকে, ভারত থেকে, সারা পৃথিবীর শোষণ বিরোধী ও মনুষ্যত্বের চেতনা থেকে। আর বাংলাদেশের বিপ্লবের বিরোধীতা এসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ থেকে ও মনুষ্যত্ব বিরোধী চীন রাষ্ট্র থেকে। এই প্রসঙ্গে এই সত্য আজ অনুভব করতে হবে যে ঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, সে ধনতান্ত্রিক কিংবা সমাজতন্ত্রী, যে রাষ্ট্র মনুষ্যত্বের বিরোধিতা করে ও ঔপনিবেশিক শোষণ জাতীয় স্বার্থে অনুমোদন করে সে-রাষ্ট্র বিপ্লব বিদ্রোহ ও মনুষ্যত্বের বিরোধী। জাতীয় স্বার্থে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক নীতি সমর্থন করছে, জাতীয় স্বার্থে সমাজতন্ত্রী চীন পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শোষণ অনুমোদন করছে ও প্রবল ভারত বিদ্বেষ থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অস্বীকার করছে। কোনদেশের মুক্তি আন্দোলন কারোর মুখ চেয়ে প্রবাহিত হয় না। মুক্তি আন্দোলন নিজস্ব নিয়মেই উৎসারিত, কোন নেতা কোন রাষ্ট্রের আপ্ত বাক্যের ওপর নির্ভশীল নয়। সেজন্যই প্রতিটি বিপ্লবীর প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের

বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে সমাজতন্ত্র, আর সমাজতন্ত্র হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী চেতনা; সর্বপ্রকার শোষণ বিরোধী চেতনা; মনুষ্যত্বের চেতনা। আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের দেশজ ও আন্তর্জাতিক পটভূমি হচ্ছে এইসব। দেশের মধ্যকার কায়েমী স্বার্থভিত্তিক সকল প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্র, কনট্রাকটরী সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক মোড়লগিরি উচ্ছেদ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার শোষণ বিরোধী আন্দোলন, নীতি, মতকে সমর্থন করে যেতে হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের বিপ্লব ক্ষেত্রে কোন-দল যদি সমাজতন্ত্রের বদলে কনট্রাকটরী সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করে তার বিরোধীতা করতে হবে; কোন-দল যদি সমাজতান্ত্রিক প্র্যশাসন ব্যবস্থার বদলে আমলাতন্ত্র জোরদার করার চেষ্টা করে তার বিরোধিতা করতে হবে; কোন-দল যদি সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতার বদলে রাজনৈতিক মোড়লগিরি ব্যবহারের চেষ্টা করে তার বিরোধীতা করতে হবে; কোন-দল যদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বদলে সৈন্যতন্ত্র প্রবর্তনের চেষ্টা করেতার বিরোধিতা করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ের প্রেক্ষিত হচ্ছে সমগ্র দেশ; এই বিপ্লবের বৈপ্লবিক মিত্রতার শ্রেণীগত ভিত্তিতে আছে বিপ্লবীরা, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত; এই বিপ্লবের দুশমন হচ্ছে ঔপনিবেশিকতাবাদের দালালরা, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও অন্যান্যর ক্রমবর্ধমান জাতীয় স্বার্থ এবং দেশের মধ্যকার আধা সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ, উঠতি বাণিজ্যিক স্বার্থ; এই বিপ্লবের বাণিজ্য ও কুটনীতির ক্ষেত্র হচ্ছে ভারত, সৌভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব যুরোপ; এই বিপ্লবের মতাদর্শে আছে সকলের জন্য স্বাধীনতা সকলের জন্য রুটি। পরাধীনতা থেকে মুক্তি স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়, শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তনা স্বাধীনতার অন্তিম লক্ষ্য; এই কারণেই এই যুদ্ধের শেষ নেই। এই কারণেই আমাদের প্রত্যেককে বিপ্লবী হতে হবে এবং বিপ্লবীর একাগ্রচিত্ততা নিয়ে দেশের পুনর্গঠনে এগিয়ে যেতে হবে। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বিপ্লবকে সক্রিয় রাখতে হবে এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই জাগরিত হবে। ঢাকা শহর আজ এই বিপ্লবের মশাল জ্বেলে তাকিয়ে আছে দূরে, দিগন্তে, ভবিষ্যতে।'

১২ই ডিসেম্বর। কার্ফু ঘনঘন, থেকে থেকে। পাড়া পাড়া তল্লাশি হচ্ছে। এটাই ভয়ঙ্কর।

নুরু এসেছে। বলল ষ্টেনসিল নষ্ট করতে হয়েছে। ফের ষ্টেনসিল কাটা হবে।

গিয়াস খবর পাঠিয়েছে দেখা করার জন্য।

১৩ই ডিসেম্বর। ফের স্টেনসিল নষ্ট করতে হয়েছে। আমাদের পাড়ায় তল্লাশি চলছে।

১৪ই ডিসেম্বর। ঢাকা খালি হতে চলেছে। মিলিটারি বের হতে দিচ্ছে না। পেট্রোল পাম্প অচল। লোকজন নৌকো করে নদী পার হচ্ছে।

১৫ই ডিসেম্বর। শোনা যাচ্ছে অবাঙ্গালীরা ধানমন্ডি হামলা করবে। আমাদের পাড়ার অনেকেই পুরানো শহরে চলে গেছেন।

রেডিওতে জয়ধ্বনি। বিবিসি আকাশ বাণী; স্বাধীন বাংলা; ভয়েস অব আমেরিকাঃ একই খবর, ঢাকার পতন আসন্ন। ঢাকা রেডিওতে মাতম চলছে।

১৬ই ডিসেম্বর। সাড়ে এগারোটার সময় ইকবাল এলেন। জানালেন আজ তিনটায় আত্মসমর্পণ হবে। বেলা দেড়টায় জেনারেল অরোরা আসবেন। আমাকে খবর দেবার জন্যই এসেছেন।

কার্ফু। শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে জয় বাংলা শ্লোগান, দেখা যাচ্ছে মিছিলের টুকরো।

প্রথমে নুরুদের ওখানে, তারপর ঝুনুর ওখানে, ওখান থেকে টেলিফোনে মিরোদের, তারপর লিলির বাসায়। ঝুনু জিগগেস করল, ওদের নিয়ে বেরোবে কিনা। বললাম, নিশ্চয়ই। এমন দিন জীবনে দুবার আসে না।

ব্যাপক ভাবে পোস্টার করাতে হবে। নুরুরা ন্যুমার্কেট ধানমন্ডি; মিরো নাহার-রা আজিমপুর লালবাগ; নজরুল গ্রীন রোড কাঠাল বাগান; খোদাদাদ শহীদ মিনার য়ুনিভার্সিটি; কুতুব বাকী সব এলাকা।

জয়নুল আবেদিনের সঙ্গে দেখা। জড়িয়ে ধরলাম পরস্পরকে। আবহমান কালের কৃষকের মতন সহিষ্ণু বীরত্ব তাঁর মুখে, তাঁর রেখার তীব্র সাবলীল তার উৎস বুঝি টের পেলাম।

ফের নুরুদের ওখানে। পিলখানা থেকে গুলি ছুঁড়েছে। ওদের এক বন্ধু আহত। গাড়ি নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে, নীলখেত দিয়ে। টিচার্স ক্লাবের সামনে আসতেই দেখা গেল একদল পাকিস্তানী সৈন্য। হেঁটে হেঁটে আসছে। আমাদের দেখেই ইশারা করল সরে যেতে। গাড়ি ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি। ছাদের ওপর দিয়ে গেল চলে। ইকবাল হলের গেটে গাড়ি থামালাম, ফের গুলি দেয়ালে বিঁধে গেল। আমরা সবাই ছিটকে বেরিয়ে গেলাম, আহত বন্ধুটি ভেতরে। ফের গুলি। দেয়ালের চুনকালি ঝরে ঝরে পড়ছে।

মেডিক্যাল কলেজ। গুলিবিদ্ধ মানুষদের কাতরানি। আজ ঢাকার সবাই রাস্তায়, আজ সবাই গুলী খাচ্ছে, আজ স্বাধীন হওয়ার দিন। ডাক্তার, নার্স, পরিচালক সবাই উদগ্রীব আর চিন্তিত। লোক আসছে কেবল, বয়ে আনছে আহত আর নিহতদের।

বন্ধুটির বাসা সেগুন বাগান। ওখানে খবর দিতে হয়। নুরুকে নিয়ে ফের রাস্তায়। আমেরিকান সেন্টারের সামনে লাশ। ফের হাসপাতাল, বন্ধুটির কাপড় জামা বালিশ পৌঁছনোর জন্য।

নুরুকে নামিয়ে ফিরছি বাসার দিকে। রাস্তা খালি। বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই মুন্নী পাগলের মতন বলে উঠেছে, কোথায় ছিলে বলো তো। এদিকে গুলী, মানুষ মারা যাচ্ছে। তিন তলার জিলানী সাহেবের বোন আর বোনের মেয়ে, ঐ মেয়েটির বান্ধবীর বাচ্চা, ড্রাইভার মোড়ে মারা গেছে। বোন এসেছিলেন এক গাড়িতে, অন্য গাড়িতে বোনের ময়ে, জিলানী সাহেবের কাছে খুশীতে, ঐ মোড়েই আধ ঘন্টা পরপর অমন ঘটেছে।

ক্লান্ত লাগছে বিষন্ন লাগছে। আজু-রা কেমন আছে, কে জানে। সারা রাত গুলি, ঘুম নেই। শেখ সাহেবের স্ত্রীর জিম্মাদারীর মালিকেরা গুলী চালাচ্ছে।

১৭ই ডিসেম্বর। সকাল বেলাতেই কুতুব এলেন। আনন্দে উল্লাসে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আজ শহীদ মিনারে বিকেলে গণ জামায়েত হবে, চারটায়। ফের মুখ নিচু করে বললেন, শোনা যাচ্ছে মুনীর ভাই, মোফাজ্জল স্যার, গিয়াস, ডক্টর রাব্বী, শহীদুল্লাহ্ কায়সারের খোঁজ নেই।

আমার চোখ থেকে রোদ সরে গেল, অন্ধকার। রক্তের মধ্যে উত্তোলিত হাত সকল, আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। আমার অস্তিত্বের একটা অংশ অন্ধকারে আর্তনাদে রক্তে ঝরে গেছে, বাংলার ঋতু সকলের মতন টালমাটাল, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত আমার গলা 'গিয়াস মুনীর ভাই...'

সকাল, দুপুর, রাস্তায় রাস্তায়। মানুষ ঘুরছে, উদ্বেগহীন, ক্লান্তিহীন। আমার শহর, চেনা শহর, আমার বন্ধুদের সহকর্মীদের খুঁজছি, আমৃত্যু।

শহীদ মিনার। এসেছেন ডক্টর কুদরত-ই-খুদা, বেগম সুফিয়া কামাল, সদ্য মুক্ত ডক্টর ওদুদ আর মাহবুব উল্লাহ, এসেছেন মুক্তি যোদ্ধারা, এসেছেন ঢাকার বাসিন্দারা সহ যোদ্ধারা। আবেদন জানান হল ঢাকা শহরবাসীর কাছে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চালু করার জন্য, দোকানপাট অফিস-আদালত খোলার জন্য; ওয়াপদা ও ওয়াসার কর্মীদের কাছে আবেদন জানান হল বিদ্যুৎ সরবরাহ ও পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য। রেডিও ও টেলিভিশন কর্মীদের কাছে আবেদন জানান হল যন্ত্রপাতি ঠিক রাখার জন্য যাতে করে বাংলাদেশ সরকার এসেই কাজ শুরু করে দিতে পারেন। আরো ঠিক হল কেন্দ্রীয় নাগরিক কমিটি গঠনের জন্য, তাতে থাকবেন ঃ বেগম সুফিয়া কামাল, ডক্টর কুদরত-ই-খুদা, কবি জসিমউদ্দীন, এডভোকেট আবদুল জলিল, ডক্টর ওদুদ, ডক্টর লতিফ, ডক্টর জহুরুল হক, ডক্টর আহমদ শরীফ, কবি শামসুর রাহমান, কুতুবুর রহমান। আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। এই কমিটির দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার না আসা পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় নাগরিক কমিটি গঠন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা, থানায় থানায় পাড়ার লোক ও মুক্তি ফৌজের সদস্য নিয়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দমন করা। বলে যাচ্ছেন মুক্তি যোদ্ধা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আর ফওজুল আকবর, বলে যাচ্ছেন ডক্টর ওদুদ আর সুফিয়া কামাল।

সুফিয়া কামাল কাঁদছেন, তাঁকে দুহাতে ধরে আমি ঃ চোখে জাগছে সুফিয়া কামাল ডক্টর কুদরত-ই-কুদা ডক্টর ওদুদ কুতুব নুরু মিরো মুন্নী লিলি ঝুনু মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ফওজুল আকবর মাহবুব উল্লাহ আমরা সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠছি ঃ আমাদের দুহাতে গিয়াস মুনীর ভাই মোফাজ্জল স্যার শহীদুল্লাহ কায়সার ডক্টর রাব্বী মীরা সালমা আমরা উঠছি শহীদ মিনারে রক্ত গোলাপে ঢেকে দিচ্ছি কান্না, আমাদের দুহাতে লাশ স্বাধীনতা স্বদেশ।